কিশোর গ্রন্থাবলী

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ছবি :
শ্রীঅরুণ সেন,
শ্রীঅশোক ধর

মুদ্রণ :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস,
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশন :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স,
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

ব্লক তৈরী :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং,
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন মুদ্রণী,
২, কার্তিক বসু রোড,
কলিকাতা-৯

গ্রন্থন :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং,
১০১, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯
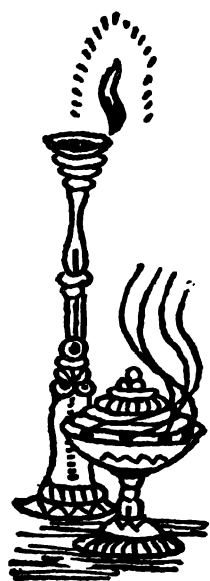
উপন্যাস
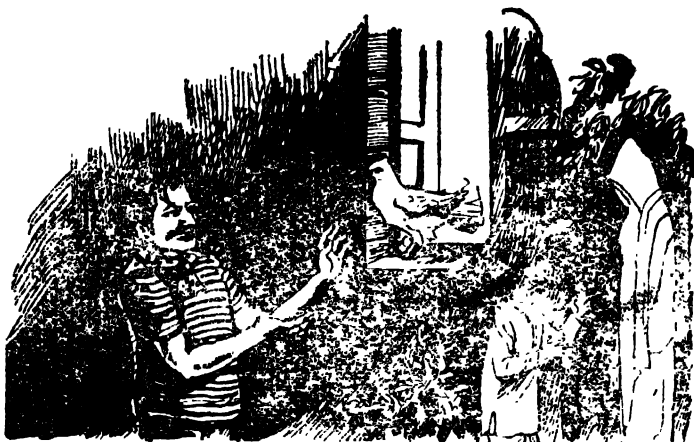
হুকাকাশির গল্প * মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

শান্তি-ধামের অশান্তি

হুকাকাশির ঘটনাবহুল জীবনের মাঝে মাঝে এমন অনেক ছোটখাটো অ্যাডভেঞ্চার ঘটেছে যা গুছিয়ে বলতে পারলে তোমাদের বেশ কিছু গল্পের খোরাক জুটে যায়। তারই একটা আজ তোমাদের শোনাব।

ঘটনাটা ঘটেছিল অনেক দিন আগে, সোনার হরিণের অনুসন্ধানে তখনও তিনি হাত দেন নি। পূজোর সময় কিছুদিন বিশ্রাম-লাভের আশায় তিনি গিয়েছিলেন বিল্বনগরম্—মাদ্রাজ প্রদেশের সীমান্তে জায়গাটি, বেশ স্বাস্থ্যকর বলে নাকি খ্যাতি আছে। সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা? তা ছিল বই কি, নইলে ওই জনবিরল তেপান্তরের মাঠে নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্বাস্থ্যলাভ হতে পারে কখনো? রণজিতের ছোট ভাই অভিজিৎ সে যাত্রায় হুকাকাশির সঙ্গী হয়েছিল।

সেদিন সকাল বেলায় চায়ের পাট চুকিয়ে দিয়ে টেবিলের ধারে মুখোমুখী বসে দু'জনে গল্পে মেতে আছেন, দেখা গেল এক মধ্যবয়সী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ফটকের সামনে এসে কেমন একটু ইতস্ততঃ করছেন,—ভাবটা ঢুকি কি ঢুকি না! হুকাকাশি মুখ তুলে চাইতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হয়ে গেল; তখন সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে ফটক খুলে তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন। হুকাকাশিকে ছোট্ট একটু নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আপনি আমায় চিনতে পারবেন না, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি; ক'লকাতায়

যেখানে আপনি থাকেন সেই ডাফ্ স্ট্রীটে আমারও বাস। কালকেই নদীর পারে বেড়াতে বেরিয়ে আপনাকে এখানে প্রথম দেখতে পাই। এই তেপান্তরের মাঠে কিছুদিন একত্র বাস করলে ক্রমে আলাপ-পরিচয়ও ঘটবে আশা ছিল, কিন্তু তখন ভাবতে পারিনি যে এক অপ্রত্যাশিত কারণে আজকেই আপনার সঙ্গে দেখা করা অনিবার্য হয়ে উঠবে। কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটায় এই বন্ধু-বান্ধবহীন দূর দেশে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছি; সকাল হতেই তাই পরম আত্মীয় জ্ঞানে আপনার কাছে চলে এসেছি।" ভদ্রলোক অতি করুণভাবে হুকাকাশির পানে চাইলেন:

হুকাকাশি নস্যদানটা খুলে জোর একটিপ নস্যি নিতে নিতে বললেন, "বেশ, আপনার রাত্রির অভিজ্ঞতা খুলে বলুন—আমার তরফ্ থেকে চেষ্টার কোনই ত্রুটি হবে না।" তার পর অভিজিৎকে দেখিয়ে বললেন, "এর কাছে আপনার দ্বিধা করবার কিছুই নেই; আমায় যা বলবার আছে নিঃসঙ্কোচে এর সামনেই বলতে পারেন।"

ভদ্রলোক তখন তাঁর বক্তব্য সুরু করলেন:

"সব ব্যাপার গুছিয়ে বলতে হলে গোড়ার কয়েকটি কথাও আগে বলে নেওয়া দরকার। পূজোর ছুটিতে কোথায় চেঞ্জে যাওয়া যায় কল্‌কাতায় বসে তারই আলোচনা হচ্ছিল, এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন বিজনগরম্। কেবল পরামর্শ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, কথা-প্রসঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে এখানে তাঁর জানাশোনা এক ভদ্রলোকের চমৎকার একটা বাড়ী আছে, এবং খুব সস্তায় সেখানা তিনি ভাড়াও দিতে পারেন।

"পূজোয় কোথাও যেতে হলে সব চেয়ে বড় সমস্যাই হল বাড়ী-সমস্যা; সেটা এত সহজেই মিটে যাওয়াতে এখানে আসাই স্থির করে ফেলা গেল। তার পর কাল সকালের ট্রেনে এখানে এসে পৌঁছেছি।

"এসে দেখলাম বন্ধুটি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি; বাস্তবিকই খাসা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ীখানা। ভেতরে অনেকখানি কমপাউণ্ড, আর গোটা বাড়ীটাই উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বাড়ীর নাম 'শান্তি-ধাম'। ও ভাড়ায় মরুভূমির ভেতরেও অমন বাড়ী কল্পনাতীত সস্তা। ঘর যা আছে আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে তা পর্যাপ্ত, কেন না আমরা ক'টি মাত্র প্রাণী—আমি, আমার স্ত্রী; বছর চৌদ্দ বয়সের একটি মেয়ে, আর সঙ্গের ঝি আর উড়ে বামুন। সদর দরজার

সম্মুখে মালপত্র নামিয়ে ভেতরে ঢোকবার উদ্যোগ করছি, লক্ষ্য করলাম রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে সে-ই যেন অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তাদের এই অহেতুক কৌতূহলের কোন অর্থ বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন বুঝছি। এ বাড়ীতে লোকের বসবাস দেখতে তারা আদৌ অভ্যস্ত নয়, কেন না এ বাড়ীর রহস্য জানতে এ অঞ্চলের কারুরই বোধ করি বাকী নেই।

"গুছিয়ে-গাছিয়ে বাড়ীটাকে বাসোপযোগী করে নিতেই সারা দুপুর কেটে গেল। বিকেলে এক কাপ্ চা খেয়ে সামনের বারান্দায় বসে সবেমাত্র খবরের কাগজখানা খোলবার উপক্রম করছি, দেখি ফটক খুলে এক প্রৌঢ় বয়সের মাদ্রাজী ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। 'গুড্ আফটারনুন্' বলে অভিবাদন করে তিনি বারান্দায় উঠে এলেন, ইংরাজীতে বললেন, 'মাফ্ করবেন, আপনিই কি এ বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন?'

"জবাব দিলাম, 'আজ্ঞে হাঁ।'

"একেবারে পাকাপাকি কথা হয়ে গেছে? ভাড়া আগাম আদায় করে নিয়েছে নাকি?"

"বললাম, কথা পাকাপাকিই হয়েছে বটে, কিন্তু ভাড়াটাড়া এখনও কিছু দেওয়া হয় নি। বাড়ীওয়ালা যে ঠিক আমার অপরিচিত এ কথা বলা যায় না।"

"কি বললেন! এ বাড়ীর মালিক রমেশবাবু আপনার পরিচিত? অথচ তিনি জেনেশুনে আপনার এ বাড়ী ভাড়া নেওয়া অনুমোদন করেছেন?" ভদ্রলোকের মুখে বিস্ময়ের স্পষ্ট ছাপ এবার ফুটে উঠল।

"বিস্মিত আমিও কম হই নি। বললাম, আপনার ইঙ্গিতটা বেশ ভাল মত বুঝতে পারলাম না, আর একটু স্পষ্ট করে বলবেন কি?"

"কিন্তু ভদ্রলোক বোধ করি আমাকে আর বেশী বিব্রত করে তোলা উচিত মনে করলেন না, কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, আপনি বিদেশী লোক, নতুন জায়গায় এসে নানা রকম অসুবিধা বোধ করা বিচিত্র নয়। সে রকম কিছু ঘটলে আমাদের খবর দিতে সঙ্কোচ বোধ করবেন না। আমার নাম ভেঙ্কটচারি, পাশের বাড়ীটাই আমার।'

"ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর মনের ভেতরটা কেমন খচ্ খচ্ করতে লাগল; একটা অজানা ভয়ও যে মাঝে মাঝে উঁকি মারছিল না এ কথাও জোর করে বলতে পারি না। যাই হোক, সব ঝেড়েঝুড়ে মনটাকে চাঙ্গা করে

তোলবার উদ্দেশ্য বিকেল বেলা সদলবলে বেরিয়ে পড়লাম নদীর ধারে—ভগবানের বিশেষ দয়া বলতে হবে, সেখানেই আপনার দেখা পেলাম। তারপর বাজার হয়ে, তরি-তরকারি আর কিছু টাটকা মাছ কিনে যখন বাড়ী ফিরলাম রাত তখন আটটা বেজে গেছে। বামুন ঠাকুর রান্নার যোগাড় আরম্ভ করল। ঠিক এই সময় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বেশ একটু হিমেল হাওয়া বইতে সুরু করে দিল। চারদিক একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ, ধারে-পাশে জনমানবের সাড়া নেই; আমরা জানালার সার্সি বন্ধ করে মাঝের হল ঘরটায় এসে বসলাম। আমার স্ত্রী একখানা মাসিক পত্রিকা পড়ে আমাদের শোনাচ্ছিলেন। পাশের কামরায় ঝির নাকের ডাক উঠে গেল। ঘড়িতে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ সকলেই যেন একটু চমকে উঠলাম, মনে হ'ল আমাদের মাথার ওপরকার ছাদে অবিশ্রাম খটাখট্ খটাখট্ কেমন একটা শব্দ হচ্ছে—ঠিক যেন ছাদ-পেটানোর আওয়াজ। একটু কান পেতে থাকতেই লক্ষ্য করলাম, শব্দটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আরও একটু বাদে অসম্ভব জোরে শব্দ হ'তে লাগল—দপ্‌, দপ্‌, ধুপ্‌, ধুপ্‌—যেন ছাদময় কারা দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আমার স্ত্রী স্বভাবতঃই একটু ভীতু মানুষ, চেয়ে দেখি তাঁর সারা কপাল ঘেমে উঠেছে, কেন না ছাদে উঠবার যে কোন সিঁড়ি নেই বাড়ীতে ঢুকেই তা আমরা টের পেয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ব্যাকুল আর্তনাদ কানে এল। দেখি কিনা, বামুন ঠাকুর রান্নাঘর ছেড়ে পাঁই পাঁই করে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদেরই দিকে ছুটে আসছে। বেচারার সারা দেহ বাঁশপাতার মত কাঁপছে, গায়ের প্রত্যেকটি রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠেছে, আর চোখ দুটো ঠিক যেন ঠিক্‌রে আসার উপক্রম! একটু বাদে, বাক্‌স্ফূর্তি হ'তে, কোনক্রমে সে জানালে যে কড়ার উপর তেল চাপিয়ে সবে ভাজবার মাছগুলো সে ছেড়েছে, অমনি সুমুখের জানালা থেকে দুধের মত সাদা দু'খানা হাত তার সামনে বেরিয়ে এল, ঠিক ভাজা মাছ চাইবার ভঙ্গীতে। সে আঁৎকে পিছিয়ে আসতেই ঝপাৎ করে একরাশ ছাই এসে পড়ল মাছ ভাজবার কড়াটার ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে কে খিল খিল করে হেসে উঠল—রক্ত-হিম-করা এক অদ্ভুত হাসি। আর এক তিলও দাঁড়াবার ভরসা সে পায় নি, দু'হাতে পৈতাগাছা জড়িয়ে 'রাম রাম' করতে করতে পালিয়ে এসেছে। এবার ভয়ে সকলেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, গিন্নীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাঁর বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও ব্যাপারটা নিজে চোখে প্রত্যক্ষ করবার জন্য একাই আমি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে

চললাম। উঠান পার হয়ে রান্নাঘরে যেতে হয়, পথে পড়ে মস্ত একটা নেবুগাছ। সবে তার তলায় এসেছি, অমনি সেই গাছের আবডাল থেকে চওড়া লাল পাড় শাড়ী-পরা, বোধ করি সাড়ে আট ফুটেরও বেশী ঢ্যাঙ্গা একটি

স্ত্রীলোক ঘোমটা মাথায় ঢিপ্ করে আমার পায়ের কাছে একটা গড় করল। অতখানি ঢ্যাঙ্গা মেয়েছেলে তো দূরের কথা, পুরুষও আমি ভাবতে পারি না। আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। রান্নাঘরে যাওয়া মাথায় উঠল, দৌড়ে কোন মতে ঘরে ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে করতে দেখতে পেলাম, হো হো করে বিকট এক অট্টহাসি হেসে স্ত্রীলোকটা রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘরে দুম্‌দাম্ হাঁড়ি-কলসী ফাটার শব্দ শোনা গেল; তার পরেই আক্রমণ সুরু হ'ল বাংলোখানার ওপরে—ঠিক বর্ষাকালের বৃষ্টির ফোঁটার মত অনবরত ইট আর পাটকেল, ইট আর পাটকেল! সারারাত ক'টি প্রাণী ঠায় ঘরের মেঝের উপর বসে কাটালাম, একটি বারের তরেও কারুর চোখের পাতা মুদতে সাহস হ'ল না। তার পর সকাল হলে ছুটে গেলাম পাশের বাড়ী,—ভেঙ্কটচারির কাছে। সমস্ত খবর খুঁটিয়ে শোনবার পর তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'হুঁ, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটেছে। কাল আপনাকে সমস্ত কথা খুলে বলা হয়নি, হয়তো আপনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়বেন মনে করে, কিন্তু আজ আর বলতে বাধা নেই যে, যে বাড়ীটা আপনি নিয়েছেন এ অঞ্চলে সবারই ধারণা ওটা ভূতের বাড়ী। প্রায় দু'বছর

হ'ল এমনি ধারা উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। এই দু' বছরে অন্ততঃ বার চারেক বাড়ীটা ভাড়া হয়েছিল কিন্তু এক রাতের বেশী কোন ভাড়াটেই টি'কতে পারে নি ওখানে। রমেশবাবু বাড়ীর ভাড়া খুবই কমিয়ে দিয়েছেন, তবু প্রাণ হাতে করে কে যাবে বলুন? শেষ বারে বাড়ীটা যখন ভাড়া হয় সে আজ ছ'মাসের কথা—সে যাত্রাও এক রাতের বেশী ভাড়াটে টেঁকে নি। ভেবেছিলাম এ ছ'মাসে কিছু উন্নতি হয়তো বা হয়ে থাকবে, কিন্তু তা যে হয়নি সে তো প্রত্যক্ষই করা গেল। ওটা আমারই পাশের বাড়ী হওয়াতে মাঝে মাঝে আমারও যে একটু-আধটু ভাবনা হয় না তা নয়, তবে ভগবানের পরম দয়া, আজ পর্যন্ত এখানে কোন উপদ্রবই ঘটেনি। আপনি এক কাজ করুন, এ-বেলার মত সব শুদ্ধু আমারই এখানে উঠে আসুন; বাড়ীতে আমার মা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী সকলেই আছেন, কাজেই মেয়েদের কোনই অসুবিধা হবে না। আজকের দিনের মধ্যেই লোকজন লাগিয়ে অন্য একটা বাড়ী খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আমি দেখছি।

"ভদ্রলোককে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে, ঝি-বামুন সমেত মেয়েদের তাঁরই ওখানে পাঠিয়ে আমি সোজা আপনার কাছে চলে আসছি। কাল রাত্তিরে নিজের চোখে যা দেখেছি তা কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারি না, অথচ বিংশ শতাব্দীর লোক হয়ে ভূতের অস্তিত্ব, বিশেষ করে ভূতের উপদ্রবের কথা বিশ্বাস করতেও মন সায় দিতে চাইছে না। যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সত্যিই আমি তাই হয়ে আপনার কাছে এসেছি, আশা করি প্রতিবেশীর এ বিপদে তাকে সাহায্য করতে আপনি বিমুখ হবেন না।"

হুকাকাশি হাতের দু'আঙুলে অবশিষ্ট নস্যিটুকু একটানে নিঃশেষ করে বললেন, "আমায় দিয়ে যতটা উপকার সম্ভব তা অবশ্যই আপনি পাবেন। অভিজিৎ, পাঞ্জাবীটা একবার গায়ে চড়িয়ে নাও তো, বাড়ীটা একটু ঘুরে আসা যাক। হ্যাঁ, আপনার নামটা কি সেটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।"

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীভবানীপ্রসন্ন গুপ্ত।"

সদর দরজার তালা খুলে সকলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বাড়ীর সমস্তটাই কম্পাউণ্ড-ওয়ালে ঘেরা, ভেতরে জায়গা প্রায় চার-পাঁচ বিঘে। পাঁচীল বরাবর ওঁরা হাঁটছিলেন, হঠাৎ হুকাকাশি হাতের রুমালখানা টপ্ করে একবার মাটিতে ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার তুলে নিলেন; ভবানীবাবু

আর অভিজিৎ কথাবার্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন, কিছু টের পেলেন না। আরও খানিকক্ষণ চলবার পর দেয়ালের ধারে এসে হুকাকাশি ফের থামলেন অভিজিৎকে লক্ষ্য করে বললেন, "মাটির ওপর এ দাগগুলো লক্ষ্য করছ? বেশ করে দেখে বল দিকিনি কিসের দাগ এগুলো?"

বাস্তবিকই জায়গাটাতে—কেবল ওই জায়গাটাতেই—কোন অজ্ঞাত জীবের ছোট ছোট গোল গোল কতকগুলো পায়ের দাগ অভিজিতের নজরে এল। অনেকক্ষণ ধরে বিশ্লেষণ করার পর সে বললে, "ঠিক ধরতে পারছি না, তবে কোন জন্তুজানোয়ারের পায়ের দাগ নিশ্চয়ই।"

"তুমি তো ভাল শিকারী, অনেক জানোয়ারেরই পায়ের দাগের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে—বল তো এগুলি কোন্ জানোয়ারের পায়ের দাগ?"

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত অভিজিৎকে স্বীকার করতেই হ'ল যে সে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। হুকাকাশি আবার বললেন, "দাগগুলো কেমন এলোমেলো সেটা লক্ষ্য করছ কি?"

"হুঁ।"

"আরও একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ—সব ক'টা দাগেরই একদিক খুব জোর স্পষ্ট ভাবে উঠেছে, অন্য দিকটা দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত হাল্কা। কেমন, নয় কি?"

অভিজিৎ ঘাড় নাড়ল, "তা বটে।"

"আর ওই যে পর পর গোটাকতক নেবু গাছ রয়েছে, তাও কিন্তু উপেক্ষার বিষয় নয়। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়, কাল রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে মাটি সর্বত্রই নরম হয়ে আছে, অথচ দাগ পাচ্ছি শুধু এই জায়গাটাতেই।"

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে আর এক অভিনব জিনিষ সকলের চোখে পড়ল—একটা চাল মাপবার ডালা বা কুন্‌কে, চলতি কথায় আমরা তাকে 'পলি' বলি। "এটা আবার কোত্থেকে এল? একেবারে আনকোরা নতুন দেখছি! আপনার সঙ্গের বুঝি?" হুকাকাশি বলে উঠলেন।

"না তো!" ভবানীবাবু জবাব দিলেন।

"ওহ্, বোঝা গেছে তবে! আচ্ছা, ভবানীবাবু, সাধারণতঃ আপনি কি মার্কা সিগারেট খেয়ে থাকেন?"

ভবানীবাবু এইবার বিস্মিত হলেন। "সিগারেট? সিগারেট তো আমি খাই না! আমি ছেড়ে আমার বামুন-চাকরদের পর্যন্ত ও জিনিষটি খাওয়া

বারণ। গিন্নীর হাঁপানির মাদুলি আছে, তামাকের গন্ধ পর্যন্ত ওঁর নাকে যাওয়া নিষেধ। ওই জন্যই তো বামুন-চাকর জোটানো আমার পক্ষে এক মহা দায়! তামাক খাবে না, বিড়ি টানবে না—এমন লোক ও-শ্রেণীর মধ্যে হাজার করা বোধ করি আপনি একজনও পাবেন না।"

"নস্যিটা নিশ্চয়ই বাদ, ওতে বুদ্ধি খোলে।" ঘনা-কাশি হেসে বললেন, "যাক্, রহস্য থাক, বাড়ীতে ঢুকে ঘরদোর, বারান্দাগুলোর আপনি কি অবস্থা দেখেছিলেন, বলুন তো?"

"ধুলো আর ঝুলে গোটা বাড়ীটাই একাকার হয়ে ছিল।"

"রান্নাঘরটা?"

"তারও ওই একই অবস্থা। পুরো এক দুপুর লেগেছে বাড়ীটাকে শুধু বাসোপযোগী করে তুলতেই।"

"উনোনও তবে পাততে হয়েছিল নিজেদেরকেই?"

"নিশ্চয়ই।"

কথা বলতে বলতে সবাই সদর দরজার দিকেই এসে পড়েছিলেন। ঘনাকাশি বললেন, "চলুন, এবার আপনার আস্তানায় গিয়ে বসা যাক। এ-বেলার মত চারির ওখানেই তো আপনার থাকবার ব্যবস্থা?"

অতিথি সংকারের জন্য ভেঙ্কটচারি তখন নিজে দাঁড়িয়ে মালী দিয়ে তাঁর বাগান থেকে কপি, বেগুন, শালগম প্রভৃতি তোলাচ্ছিলেন, সেখানেই সকলের তলব পড়ল। শিষ্টাচারের পালা শেষ হলে, চারিকে ঘনাকাশি বললেন, "বাগানখানা করেছেন তো মন্দ নয়, সব রকম তরি-তরকারিই তো দেখতে পাচ্ছি!"

বাগান সম্বন্ধে ভেঙ্কটচারির সত্যিকারের গর্ব ছিল। একটু সলজ্জ হাসি হেসে তিনি বললেন, "এ আমার একটা 'হবি'। ছোট বাগান, তবে এরই মধ্যে যতটা হয় চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আসুন না, দেখবেন সবটা।"

ঘুরে ঘুরে সকলে বাগান দেখতে লাগলেন, সেই সঙ্গে রমেশবাবুর ভূতুড়ে বাড়ীটা সম্বন্ধেও আলোচনা চলতে লাগল। ঘনাকাশির আরও যে সব তথ্য জানবার ছিল, চারির কাছ থেকেই তা জেনে নিলেন। রমেশবাবুর বাংলো থেকে ক্রমে গোটা সহরটার কথা উঠল। চারি বললেন, "সহরের আশ-পাশে দেখবার অনেক কিছুই আছে, চলুন একদিন সঙ্গে করে আপনাদের সব দেখিয়ে আনা যাবে—য়্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আমারই গাড়ী।"

হুকাকাশি বললেন, "আপনার আবার নৌকো চালাবারও হবি আছে নাকি? কিন্তু এদেশের নদীতে কি বারো মাস জল পান?"

"নৌকো চালানো! না না, সে সব হবি আমার নেই। এগুলো আঁকশি, মালীদের ব্যবহারে লাগে। আরে, কে ও, সম্মুখম্ নাকি? রামানুজম্‌কে জিজ্ঞাসা কর্ তো, ওরা বাড়ী হোয়াইট ওয়াশ্ করে দিতে রাজী হয়েছে কিনা! ভাল কথা, গল্পে-গল্পে আসল কথাই আপনাকে বলা হয়নি ভবানীবাবু! ছোটখাট একখানা বাড়ী ভদ্রপল্লীর ভেতরেই পাওয়া গেছে। আশা করি এবার আপনার ভেকেশন্‌টা শান্তিতেই কাটবে।"

বেলা নাগাদ তিনটের সময় হুকাকাশি অভিজিৎকে খামে মোড়া একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, "আমি বেরুচ্ছি, ভবানীবাবুদের সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাব। ঠিক পাঁচটার সময় তুমি গিয়ে ভেঙ্কটচারির হাতে এ চিঠিখানা দিয়ে আসবে; কেমন, পারবে তো?"

"তা আর না পারবার কথা কি! কিন্তু এ কিসের চিঠি? কী লেখা আছে এতে?"

"এ চিঠিতে ভেঙ্কটচারিকে লেখা হয়েছে, রমেশবাবুরও বাড়ীটাকে ভূতুড়ে বাড়ী বলে লোকসমাজে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা আজ থেকে তিনি একদম ছেড়ে দেবেন; নইলে ভেতরকার সমস্ত রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে। তিনি এ সহরে বিশেষ সম্মানিত লোক, তাঁর আর অপদস্থের সীমা থাকবে না।"

অভিজিৎ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। "বাড়ীটাকে ভূতের বাড়ী বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন ভেঙ্কটচারি? বলেন কি! কিন্তু তাতে তাঁর লাভ?"

"লাভ, মাটির দরে ও বাড়ীখানা কিনে নেওয়া। বসত বাড়ী এবং 'হবি'র বাগান—দু'টোরই কলেবর কিছু বৃদ্ধি পাবে, আর ফালতু আরও একখানা বাড়ী লাভ হবে, যার দাম কম-সে-কম বিশ হাজার টাকা। রমেশবাবু থাকেন সুদূর কলকাতাতে; তিনি যখন দেখবেন ভাড়াটের পর ভাড়াটে মাত্র একটা রাত্রি বাসের পরেই ভূতের উপদ্রবে বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে, ভাড়া যথেষ্ট কমিয়েও সিকি পয়সার আয় হচ্ছে না, তখন যে দাম পান তাতেই ওটা বেচে দিতে তিনি উৎসুক হয়ে পড়বেন—চার হাজার, তিন হাজার—যা আসে। প্রথমে হয়তো কোন ভাড়াটে অহেতুক কোন কারণে ভয় পেয়েছিল,

সেই থেকেই চারি ভায়ার মাথায় ফন্দিটা আসে। আসল ব্যাপারটা কি করে আমি আঁচ করলাম বলি শোন। আজ সকালে রমেশবাবুর বাড়ীর কম্পাউণ্ডটা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন রান্নাঘর থেকে অনেকটা দূরে এসে আধ-পোড়া একটা সিগারেট পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। কাল রাত্তিরে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, অথচ সিগারেটের ওপর তার চিহ্নমাত্র নেই। বোঝা গেল, বৃষ্টি থামবার পর এইখানটাতে কেউ সিগারেট ফুঁকেছে। এদিকে ভবানীবাবু বলে রেখেছেন বৃষ্টি ধরার পর তাঁরা কেউই ঘরের বার হন নি, কাজেই বুঝতে হবে এ সিগারেট বাইরের কোন লোকের খাওয়া। রুমালে করে তুলে তক্ষুণি সেটা পকেটে পুরে ফেললাম।

"তার পর আরও এগিয়ে পাঁচীলের কাছাকাছি আসতেই সেই রহস্যময় দাগগুলো দেখতে পাওয়া গেল। কোন অজানা জানোয়ারের পায়ের দাগও হতেই পারে না, কেন না প্রত্যেক জীবেরই একটা পা থেকে অন্য আর এক পায়ের ভেতর প্রকৃতিদত্ত একটা স্বাভাবিক ব্যবধান আছে যা মোটামুটি চলবার পথের দাগেও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ও দাগগুলো একেবারেই অসম্বদ্ধ, এলোমেলো—কোনটা হয়তো মাত্র দু' আঙুল দূরে, আবার কোনটা পাঁচ হাত তফাতে। তা ছাড়া জানোয়ারের পায়ের দাগ হলে মাত্র একটু জায়গাতেই তা আবদ্ধ থাকবার কারণ কি? আরও একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে পাঁচীলের কাছাকাছি এ দাগগুলো পাচ্ছি, আর সবগুলো দাগেতেই পাঁচীলের বিপরীত দিক্‌টা খুব গভীর হয়ে বসেছে, অথচ পাঁচীলের দিক্‌টা অপেক্ষাকৃত হাল্কা। অর্থাৎ লগীর সাহায্যে পোল ভল্ট করে দেওয়াল টপ্‌কালে যে রকম হওয়া উচিত ঠিক সেই রকম। অবশ্য লগীর দাগ বলে কারো মনে যাতে কোন রকম সন্দেহ না হয় সেই উদ্দেশ্যে ওগুলোর গোড়ায় এক একটা করে বিশেষ আকারের লোহার টুপি পরিয়ে নেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই। জায়গাটাকে আড়াল করে নেবু গাছের ঝাড় থাকায় সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল; বাস্তবিক, অলক্ষ্যে অনেক লোকের দেওয়াল টপ্‌কাবার এমন চমৎকার জায়গা আর কোথাও নেই। বুঝলাম, ভূত নয়, কয়েকজন মানুষের দ্বারাই রাত্তিরে উপদ্রবটি ঘটেছে। কিন্তু কেন? ভবানীবাবু যখন বললেন তিনি আসার আগে সমস্ত বাড়ীটা ধুলোয় আর ঝুলে ভরতি হয়েছিল তখন কোন চোর-ডাকাতের পাকা আড্ডা বলেও সেটাকে মেনে নিতে পারলাম না।

"যেখান দিয়ে লোকগুলো দেওয়াল টপকে বেরিয়ে গিয়েছিল—অর্থাৎ

পাঁচীলের ওধারটাও একবার পরীক্ষা করা দরকার বোধ হল। সেটা চারির কমপাউণ্ডের মধ্যে। বাগান দেখবার অছিলায় বরাবর পাঁচীলের আশপাশে নজর রেখে এগুতে লাগলাম। রমেশবাবুর বাড়ীর নেবুঝাড়ের বরাবর আসতেই ওধারের মত পাঁচীলের এধারেও অবিকল সেই রকম লগীর দাগ দেখতে পেলাম। বুঝলাম এ পথেই প্রভুদের যাওয়া এবং আসা দু'টি কাজই ঘটেছে।

"এইবার একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জেগে উঠল। চারি বিশেষ ধনী লোক; দাসদাসী, মালী-বেহারায় তার বাড়ী ভরতি। রাত দশটার সময় তাদের সম্পূর্ণ অজানাতে কতগুলো বাইরের লোকের পক্ষে তারই বাগানের ভেতর দিয়ে পাঁচীল টপ্‌কে ওভাবে যাতায়াত করা কি সম্ভব? মনে ঘোরতর সন্দেহ হ'ল। তারপর তার গ্যারেজের পেছনে লম্বা লম্বা অনেকগুলি বাঁশের লগী পড়ে থাকতে দেখে সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল, কেন না চারি এগুলোকে আঁকশি বলে চালাবার চেষ্টা করলেও ওগুলোর প্রত্যেকটারই গোড়াতে লোহার টুপি আঁটবার ব্যবস্থা আমি দেখতে পেলাম। আর ঠিক সেই সময়টাতেই আঁকশির কথা জোর করে চাপা দিয়ে ওর বাড়ীর কথা তোলার চেষ্টা তুমিও বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে।"

অভিজিৎ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, একটুখানি চুপ করে থেকে সে বললে, "আর ওই চাল মাপবার পালিটা? ওটা ওখানে এল কোথা থেকে?"

হুকাকাশি একটু হেসে তাঁর দু'টো হাত মাথার দু'পাশ দিয়ে সোজা ওপর পানে তুলে দিলেন, বললেন, "এইবারে আমার দু' হাতের ডগায় ওটা চাপিয়ে দাও তো! কেমন, ঠিক মানুষের মাথার মতই মনে হচ্ছে কিনা? এখন যদি আমার গায়ে লালপাড় শাড়ী জড়িয়ে এই পালির ওপর ঘোমটা পরিয়ে দেওয়া হয় আর সেই অবস্থায় আমি তোমার পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকি তবে এই কার্তিক মাসেও তুমি ঘেমে উঠবে। অথচ আমি যে খুব ঢ্যাঙ্গা এ কথা বোধ হয় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুও প্রাণ খুলে বলতে পারবেন না।"

সে রাত্রিটা হুকাকাশি আর অভিজিৎ ভবানীবাবুদের সঙ্গে তাঁদের বাংলোতেই কাটিয়েছিলেন, আর সন্ধ্যার পরেই গোটা দুই ফাঁকা আওয়াজ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের আরও একটি সঙ্গী আছে—বন্দুক। এর পর থেকে আর কোন দিন 'শান্তি-ধামে' ভূতের উপদ্রবের কথা শোনা যায়নি।

॥ দুই ॥

৬ের নং বাড়ীর রহস্য

ব্যাপারটা ঘটেছিল এক পূজার বন্ধে; হুকাকাশি গিয়েছিলেন শিলং, আর রণজিৎ ভাড়া নিয়েছিল কল্‌কাতারই সহরতলিতে একটা বাগান ঘেরা সুন্দর বাড়ী। রণজিতেরই জিৎ হল, কেননা হুকাকাশি লিখে জানালেন, অনবরত বৃষ্টির চোটে তাঁর চেঞ্জ মাথায় উঠেছে, আর কোথাও যেতে পারলে তিনি বাঁচেন। রণজিৎ তাঁকে তার নিরিবিলি বাড়ীখানাতে দিন কতক এসে থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করল, হুকাকাশিও শিষ্ট ছেলের মত ফিরে এলেন।

হুকাকাশিকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য রণজিৎ স্টেশনে উপস্থিত ছিল। গাড়ী করে বাড়ী আসবার পথে হুকাকাশি বরাবর লক্ষ্য করলেন, রণজিৎ যেন বেশ একটু গম্ভীর, যেন কিছু চিন্তান্বিত। "ব্যাপার কি রণজিৎবাবু, আজ আপনার নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে!" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, দেশটা দিনেকের দিন এমেরিকা হয়ে দাঁড়াল নাকি তাই ভাবছি।"

"কি রকম, লোকগুলো হঠাৎ খুব ফর্সা হয়ে যাচ্ছে নাকি? নাকি গঙ্গার ধারে ছাপান্ন-তালা বাড়ীর ভিৎ গাঁথা হচ্ছে?"

"ও দু'টোর কোনটাই খুব ভয়ের কথা নয়, কাজেই ওর জন্য চিন্তিত হবার কারণ নেই। কিন্তু ইয়াঙ্কি গুণ্ডারা যে ছেলে ধরে এনে তাকে লুকিয়ে রেখে আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি পাঠায়—'পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলবে তো ফেল, নয়তো ছেলে ফিরে পাবার আশা ছাড়'—আমাদের দেশেও যদি এই ধরণের গুণ্ডামির চলন হয়, তবে একটু ভাববার কথা হয়ে পড়ে বৈকি?"

"কথাটা আর একটু সোজা ভাষায় বলুন রণজিৎবাবু। দুনিয়ার হালচাল দেখে আপনি কি একটা দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করছেন, না কি বাস্তবিকই ওই ধরণের কোন ব্যাপার আপনার নজরে এসেছে?"

"দেখুন, আপনি দু'দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছেন, এখানে একটা জটিল কেস আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে স্বভাবতঃই আমার দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু পরশু রাত্রে যে অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমার মনে গুরুতর সন্দেহ জেগে উঠেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, সমস্ত জেনেশুনেও যদি চুপ করে থাকি, ভগবান হয়তো সইবেন না। ব্যাপারটা খুলে বলি, শুনুন......এখানে যে পাড়াটিতে আমি বাড়ী নিয়েছি সেটা খুবই নিরিবিলি, লোকজনের আসা-যাওয়া নেই বললেই চলে। আমার বাড়ীর কাছেই আর

একটা ছোট মত একতালা বাড়ী, ও রাস্তার ১৩ নম্বরের বাড়ী—আসা অবধি খালিই পড়ে আছে দেখছি। অনেক দিন থেকেই নাকি খালি আছে। পরশুদিন সারাক্ষণটাই বেশ গুমোট গিয়েছিল; অনেক রাত পর্যন্তও কিছুতে যখন ঘুম এল না, তখন দরজা খুলে বাড়ীর দক্ষিণ দিক্‌কার বারান্দাটায় গিয়ে বসলাম—যদি কিছু বাতাস পাওয়া যায় সেই আশায়। বসে আছি প্রায় মিনিট পাঁচেক, হঠাৎ মনে হল তের নম্বর বাড়ীটা থেকে কেমন একটা কাতর গোঙানির আওয়াজ আসছে। আস্তে আস্তে আওয়াজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল, কে যেন অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি করছে—'বাবা গো গেলুম! আমি আর পারি না—এর চেয়ে তোমরা আমায় মেরে ফেলে একদম্ মুক্তি দিয়ে দাও—মুক্তি দাও। ওই ছুরিখানা দাও আমার পেটে ঢুকিয়ে দাও, এ নরক-যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারি না।'

"ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি; তৎক্ষণাৎ ওই অবস্থাতেই নীচে নেমে এলাম—ও বাড়ীটাতে গিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারখানা কি। ওখানে গিয়ে কিন্তু বিস্ময় আমার শতগুণ বেড়ে গেল; সামনের দিককার সমস্ত জানলা-কপাট বন্ধ, আর সদর দরজায় ঝুলছে প্রকাণ্ড একটা তালা। দেখলে স্বভাবতঃই মনে হবে যে ওই বাড়ীটাতে কেউ যে বসবাস করছে, ভেতরের লোকেরা বাইরের কাউকে তা বুঝতে দিতে চায় না। এ অবস্থায় আর ভোর না হওয়া অবধি হঠাৎ কিছু করা উচিত হবে না ভেবে সে রাত্তিরের মত চলে এলাম। তারপর সকালে গিয়ে দেখি তালাটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বটে, তবে দরজা বন্ধই রয়েছে। আমি বারান্দায় গিয়ে উঠতেই একটা ইতর চেহারার নিম্ন শ্রেণীর লোক বার হয়ে এল, আমার পা থেকে মাথা অবধি বার দু'তিন বেশ করে দেখে নিয়ে হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই এখানে?'

"তোমরা বুঝি এ বাড়ীটাতে নতুন ভাড়াটে এসেছো?"

"লোকটা ফের সন্দেহের চক্ষে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, 'হু'

"এরপর কোন কথাই যেন আমার মনে এল না; কি বলে আলাপ আরম্ভ করা যায় ভাবছি, হঠাৎ লোকটা আমার মুখের উপরই ঝপ্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমারও মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল—ভেতরের লোকদের কোন কথাবার্তা শোনা যায় কিনা একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। তৎক্ষণাৎ খুব ঘটা করে চটি জুতোর শব্দ শুনিয়ে শুনিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম; তারপর চটি বাইরে রেখে, পা টিপে চুপি চুপি বারান্দায়

উঠে এসে দাঁড়ালাম, কপাটের গায়ে কান লাগিয়ে। শোনা গেল, কে একজন ফিস্ ফিস্ করে অপর আর একজনকে শাসাচ্ছে 'হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার। কেউ টের পেলে সবশুদ্ধ মারা পড়ব—শুধু আমি একা নই, তোরাও বাদ পড়বি না। পেছনের দুয়ার······' তার পরের কথাগুলো আর কানে এল না, তবে জেলখানার কথাটার উল্লেখ যেন শুনতে পেলাম বলে মনে হল। তক্ষুনি আমি থানায় গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে দিয়ে আসতাম, যদি না জানা থাকত আজই আপনি এসে পৌঁছুচ্ছেন।······কি রকম মনে হয় আপনার ব্যাপারটা ?"

বিকালের দিকে, বেলা নাগাদ পাঁচটায় রণজিৎকে সঙ্গে করে হুকাকাশি ১৩ নম্বরের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ফটক থেকে ছোট্ট একটা লাল সুরকির রাস্তা বাড়ীর সামনা দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে আবার ফটকের কাছে চলে এসেছে। সেটুকু পার হলেই বারান্দা। ওঁরা গিয়ে সেই বারান্দায় উঠতেই সকাল বেলাকার সেই চাকরটা ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ; তারপর সেই সকাল বেলাকারই প্রশ্ন—"কি চাই এখানে ?"

"কর্তা আছেন ? আমরা এই পাড়ারই লোক, আলাপ-পরিচয় করতে এসেছি।" হুকাকাশি বললে।

"এখন দেখা হবে না, তিনি ঘুমোচ্ছেন।"

রণজিৎ আড়চোখে একবার হুকাকাশির দিকে চাইল, বোধ হয় আশ্বিন মাসের বেলা পাঁচটা যে ঘুমোবার পক্ষে খুব প্রশস্ত সময় নয় সেই তথ্যটুকুই স্মরণ করিয়ে দিত। কিন্তু চাকরটার ভাবভঙ্গী খুবই সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়বার আর কোন বাক্যব্যয় না করে ওবেলার মত এ বেলাও ঝপ করে সে দরজা বন্ধ করে দিল। অগত্যা রণজিৎদের ফিরতে হল।

রাত তখন বোধ করি বারটা, সমস্ত সহর নিঃঝুমে, অকাতরে ঘুমাচ্ছে, হঠাৎ হুকাকাশির শোবার ঘরে বার কতক কড়া নাড়ার আওয়াজ হল। "কে ?" হুকাকাশি প্রশ্ন করলেন।

"আমি রণজিৎ। শীগ্‌গির দোর খুলুন, খবর আছে।"

হুকাকাশি উঠে এসে দরজা খুলে দিতে দিতে বললেন, "খবর আমি জানি, মানে কাৎরানি আর গোঙানির শব্দ আমারও কানে আসছে।"

"তা হলে এখন আমাদের কি কর্তব্য ?"

"চুপটি করে শুয়ে থাকা, মানে ভোরের জন্য অপেক্ষা করা।"

পরদিন প্রাতঃকৃত্য এবং চা-পানাদি শেষ করে হুকাকাশি একবার দক্ষিণ

দিকের বারান্দাটা ঘুরে এলেন, তারপর বললেন, "চলে আসুন রণজিৎবাবু, কর্তাগোছের এক ব্যক্তি বারান্দার ওপরে সশরীরে দেখা দিয়েছেন। দেখা তো দিতেই হবে, কাল দু'দু'বার 'পাড়া পড়শীরা' খোঁজ নিতে এসেছিল শুনেছে, এর পরেও দরজা এঁটে বসে থাকলে যে নিজে থেকেই নিজের ওপর গুরুতর সন্দেহ ডেকে আনা হবে। আসুন, এই সুযোগে ওকে একটু নাড়া দিয়ে আসা যাক।"

খুব বেশীক্ষণ 'নাড়া দেওয়া' কিন্তু সম্ভব হল না, মিনিট পনেরো পরেই দু'জনাকে ফিরতে হল। হুকা-কাশি একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখে কি রকম মনে হল লোকটাকে? দেখি আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তিটা।"

রণজিৎ হেসে বললে, "প্রথমতঃ মাথার চুলগুলো খাড়া-খাড়া, দ্বিতীয়তঃ ডান হাতের গেঞ্জির হাতটা নীচের দিকে বার বার টেনে দেয়, তৃতীয়তঃ— তৃতীয়তঃ কি? আপনিও দু'চারটা বলুন না?"

"বেশ তো বলছিলেন, বলে যান না—তৃতীয়তঃ কাল রাত গোটা তিনেকের সময় ওর বাড়ীতে মোটরে করে লোক এসেছিল…"

"কই, তা' তো বুঝতে পারিনি, আপনি টের পেলেন কি করে?"

"অতি সহজ উপায়ে; কাল মাঝ রাত্রের পর এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ওই তের নম্বর বাড়ীর সামনে ভিজে সুরকির রাস্তার উপর মোটরের চাকার দাগ এখন পর্যন্ত দিব্যি খাঁজ খাঁজ কাটা অবস্থায় রয়ে গেছে, কাল বিকেলে এ দাগ ছিল না। তা ছাড়া মোটরের কলকজাও ছিল কিছু খারাপ, খানিকটা লুব্রিকেটিং অয়েল তাই চুঁইয়ে পড়েছে। রাস্তার সমস্ত জল একদম শুকিয়ে গেছে, কেবল ওই তেলের নীচেই একটুখানি জল এখনও চিক্ চিক্ করছে শুকোতে পায়নি। এর থেকেছ স্পষ্ট বোঝা যাবে সে বৃষ্টি ধরার খুব পারে মোটর আসেনি।"

রণজিৎ খুব আশ্চর্য, এবং বোধ করি একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠল, "তবে তো প্রকাণ্ড একটা সুযোগ হারিয়েছি আমরা কাল রাত্রে।"

হুকা-কাশি হেসে বললেন, "ব্যস্ত হবেন না, মোটর পালিয়ে যাবে না, আজ রাত্রেও নিশ্চয় ওটা এসে হাজির হবে। আপনি শুধু একটা টর্চের ব্যবস্থা রাখবেন।"

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর রণজিৎ হুকা-কাশিকে এসে পাকড়াও করল,

"আপনার টেবিলের ওপর আধ ছটাকটাক নুন এল কোত্থেকে মিষ্টার হুকা-কাশি ?"

"ও ওই তের নম্বর বাড়ীর নুন; দেখবেন তরকারীতে চালিয়ে দেবেন না যেন!"

"তের নম্বর বাড়ীর নুন? এল কি করে?"

"আজ সকালে যখন কর্তার সঙ্গে মোলাকাৎ ক'রতে যাই, তখন সিঁড়ির নীচে ন্যাকড়ায় জড়ানো অবস্থায় ওটুকু পাওয়া গেছে। আপনি টের পাননি, জুতো খুলে পায়ের আঙ্গুলে করে তখনই ওটা আমি তুলে নিয়েছিলাম।"

পরদিন সকালে উঠে রণজিৎ চাকরের মুখে শুনতে পেল হুকাকাশি নাকি খুব ভোরেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরী হতে পারে। খুব বেশী দেরী কিন্তু হল না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন সঙ্গে একেবারে একটা ট্যাক্সি নিয়ে। চাকরকে তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানাপত্রগুলি তাতে তুলতে বলে রণজিতের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "আমায় মাপ করবেন রণজিৎবাবু, দিন কতকের জন্য একটা হোটেলে গিয়ে আমাকে উঠতেই হবে। তবে যত শীগ্‌গির সম্ভব ফিরে এসে ফের আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব, কথা দিয়ে যাচ্ছি।"

হুকাকাশির নিষেধ ছিল, তাই রণজিতের হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন আর তাঁর হোটেলে সে যায়নি, কিন্তু পরদিন দুপুরেই এসে সে উপস্থিত হল। হুকাকাশি তখন বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে একখানা টাইম-টেবিলের পাতা উল্‌টাচ্ছিলেন।

হোটেলের চারধারটা একবার দেখে নিয়ে রণজিৎ বলল, "আপনার রুম অবশ্য মন্দ নয়, তবে আলো-বাতাসের দিক থেকে দেখতে গেলে পাশের কামরাটা আরও ভাল। ওটা তো তালাবন্ধ দেখছি, কেউ আছে নাকি?"

"কেন উঠে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি? থাকতে হবে কিন্তু 'চাটুয্যে-বাড়ুয্যে' অবস্থায়, কেননা ওতে থাকে একজন রাত্রির বাসিন্দে। রাত্রি দশটা থেকে ভোর ছটা তার এলাকা। দিনের বেলাটা অবশ্য আপনার রাজত্ব চলতে পারে।" হুকাকাশি হাসলেন—"বাস্তবিক, কি দারুণ চাকরী বলুন তো। পাক্কা পনেরো ষোল ঘণ্টা ডিউটি। তার ওপর আবার একদিন লেট্ হলে চাকরী নিয়ে টানাটানি! দেখছি তো লেট্ হবার ভয়ে বেচারা

কাল বেগ্‌নে হয়ে গেছল, চাকরীর এমন মোহ! ভাল কথা, আমি আজ একটু বাইরে যাচ্ছি; কম্বৌলির নাম শুনেছেন তো—সেইখানে। খুব বেশী দূর নয়, নৈহাটী থেকে মাত্র মাইল দুই। চলুন না আমার সঙ্গে, আপনার তো ইতিহাসে খুব ইণ্টারেস্ট, কম্বৌলির মিউজিয়ামটাও এই ফাঁকে দেখে আসতে পারবেন।"

রণজিতের একেবারেই আপত্তি ছিল না, বেলা দু'টার গাড়ীতে দু'জনে রওনা হয়ে পড়লেন।

কম্বৌলিতে পৌঁছে ওঁরা উঠলেন ডাকবাংলোয়। রণজিৎকে খানিকটা বিশ্রাম করে নিতে অনুরোধ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুকা-কাশি বার হয়ে পড়লেন, তাঁর কতগুলো জরুরী কাজ আছে, সেগুলো সেরে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তিনি ফেরবার চেষ্টা করবেন। কাল বরং সুবিধামত এক ফাঁকে কোন সময় মিউজিয়ামটা দেখে আসা যাবে।

যথা সময়ে ডাকবাংলায় ফিরে এসে হুকা-কাশি দেখলেন, রণজিৎ দোকান থেকে একরাশ খাবার আনিয়ে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। হুকা-কাশিকে ফিরতে দেখেই সে প্রশ্ন করে উঠল, "কদ্দূর কি করে এলেন?"

"রসুন, রসুন, অত ব্যস্ত হলে কি চলে? আরও দিন দুয়েক আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার মিউজিয়াম দেখবার মৎলব বোধ হয় ছাড়তে হল—ওতে নাকি কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাই, পাস্ চাই, অনেক কিছু ভজকট সম্প্রতি হয়েছে। আমাদের এখানে চেনেই বা কে, আর পাস্‌ই বা কে দিতে যাচ্ছে?"

কিন্তু রণজিতের বরাত ভালই বল্‌তে হবে, কেননা প্রায় বিনা ঝঞ্ঝাটেই মিউজিয়াম দেখার অনুমতি মিলে গেল। রণজিৎ পরমানন্দে হুকাকাশির সঙ্গে মিউজিয়াম দেখতে রওনা হয়ে পড়ল। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সমস্ত দেখে সিঁড়ি দিয়ে তাঁরা নামছিলেন, রণজিৎ বললে, "চমৎকার সংগ্রহ। ব্যবস্থাও ভাল, হবে না? অতগুলো কর্মচারী অনবরত খাটছে। আপনি দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে আলাপ করছিলেন? ওই বুঝি মিউজিয়ামে কিউরেটার?"

"না, কিউরেটার উনি নন্, অন্য পাঁচজনের মত উনিও একজন সাধারণ কর্মচারী। লোকটির জ্ঞান-পিপাসা দেখে একটু আলাপ করতে ইচ্ছা হল—দেখুন ওঁর টেবিলের ওপর কতগুলি বই পড়ে। হ্যাঁ যা বলেছেন, সংগ্রহ চমৎকারই বটে, তবে আর দিন পাঁচ-সাত আগে এলে আরো ভাল হত,

কেননা একটা স্পেশাল এক্জিবিসন ছিল; সেটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"তাই না কি, কে বললে?"

"কে আর বলবে, এই দেখুন না," হুকাকাশি সিঁড়ির পাশে একখানা ছাপানো বিজ্ঞাপন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, "নির্দিষ্ট দিনের আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।"

কথা বলতে বলতে দু'জনে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, হুকাকাশি বললেন, "আপনি এবার ডাকবাংলার দিকে এগোন, কাজকর্ম আমার যা কিছু বাকী আছে সব চুকিয়ে আমিও এসে জুটছি। আজকেই আমরা ফিরে যেতে পারব আশা করি।"

বাস্তবিকই সেদিনই তাঁরা কম্বৌলি ছেড়ে ফের কলকাতা ফিরে এলেন— অবশ্য রণজিতের বাড়ীতে নয়, হুকা-কাশির হোটেলে। ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতেই হোটেলের ম্যানেজার হুকাকাশির কাছে ছুটে এলেন। "এইমাত্র আপনাকে টেলিফোন করছিল," তিনি বললেন।

"কোথেকে?"

"মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে।"

কথা বলতে বলতে তাঁরা হোটেলের আপিস কামরায় এসে ঢুকলেন। হুকাকাশি তাড়াতাড়ি টেলিফোনের হাতলটা তুলে নিয়ে অটোমেটিক নম্বর ঘুরিয়ে বললেন, "হ্যালো, মেডিক্যাল কলেজ হস্পিটাল? আমি হুকাকাশি। ওঃ, আপনি দারোগাবাবু! কি খবর। এক্স-রে হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, জানি এক ছড়া মালা তো? ওটা খাঁটি মুক্তোর, দাম কম্সে-কম পঞ্চাশ হাজার টাকা।" হুকাকাশি হেসে রিসিভারটা রেখে দিলেন।

রণজিৎ স্তম্ভিত, বিহ্বলের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হুকাকাশি আবার একটু হেসে বললেন, "আপনার প্রতিবেশী তের নম্বর বাড়ীর সেই নতুন ভাড়াটেটির রহস্য ভেদ হয়ে গেছে। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। অবশ্য আজকে আমরা কম্বৌলির মিউজিয়াম দেখতে না গেলে এত সহজে রহস্যটা ভেদ হত কিনা সন্দেহ। আপনাকে বলেছি, পাঁচ-সাত দিন আগে ওই মিউজিয়ামে একটা স্পেশাল এক্জিবিসনের বন্দোবস্ত হয়েছিল, নানান জায়গা থেকে অনেক দামী-দামী জিনিষ তাতে আসে। সে সমস্ত জিনিষের ভেতর ছিল এক ছড়া ষোড়শ শতাব্দীর মুক্তোর মালা, প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের

সঙ্গে সেটা জড়িত। মিউজিয়মের একজন কর্মচারী দেখল, সেটাকে এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে তেমন হাত সাফাইওয়ালা লোকের পক্ষে ওটা সরিয়ে ফেলা আশ্চর্য নয়। সে তার পূর্ব-পরিচিত এক ভদ্রবেশী জোচ্চোরের সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলল—ভীড়ের সুযোগ নিয়ে জোচ্চোর সেই মালাছড়াকে ট্যাঁকস্থ করবে। লোকটা বাস্তবিকই নিপুণ হাতে মালাগাছা সরিয়ে ফেললে, কিন্তু ঠিক 'হজম' করা তার সাধ্যে কুলাল না, কেননা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিউজিয়মের রক্ষীরা টের পেয়ে গেল যে একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। ব্যস্, অমনি সে ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে কড়া পাহারায় প্রত্যেকের দেহ তালাস সুরু হল। জোচ্চোর দেখলে আর উপায় নাই, এক্ষুণি নির্ঘাৎ মারা পড়বে—প্রাণের দায়ে তাই সে তখন কপ্ করে গোটা মালাছড়াই গিলে ফেললে। ফলে কর্তাদের শুধু দেহ-তালাসই সার হল, বামাল মিল্‌ল না। সেদিনই স্পেশাল একজিবিসন বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর নিয়ম করা হয়—বিনা পাসে মিউজিয়ামে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

"এদিকে মালা গেলবার পরই জোচ্চোরের অবস্থা কাহিল, অসহ্য পেটের ব্যথা। বেচারা সইতেও পারে না, মুখও খুলতে পারে না, কেননা প্রকাশ্যে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাতে গেলেই ভেতরের সব কথা ফাঁস হয়ে পড়বে, আর তার ফল হবে শ্রীঘর। ব্যাপার দেখে মিউজিয়ামের সেই কর্মচারী—তার নাম এখনও জানতে পারিনি, কাজেই মিউজিয়মের কর্মচারী বলেই তাকে উল্লেখ করব—এক রাত্রে ওকে এখানে নিয়ে এসে খুব নিরিবিলি পল্লীতে একটা বাড়ী ভাড়া নিলে। পেটে অস্ত্র করা ছাড়া এ ব্যামোর আর চিকিৎসা নেই; সে রকম ডাক্তার হয়ত মিলতে পারে, কিন্তু ও-চিকিৎসায় জোচ্চর বেজায় গররাজী। বুঝলেন না, পাপ মন কিনা, ভাবলে হয়ত পেট কাটার ছুতোয় পৃথিবী থেকেই তাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা হবে। তাই চেষ্টা চলতে লাগল নানা রকমের জোলাপ নিয়ে। দিনের বেলা বাড়ীর ভিতর চীৎকার হলে পাড়াপড়শীর সন্দেহ জাগতে পারে, তাই ওসময়টা বেশীর ভাগই মর্ফিয়া ইন্‌জেক্ট করে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত; জেগে থাকলেও প্রাণের দায়েই ও নিজেও দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকত। যত গোলমাল রাত্রিতে, জাগলে পরেই কাৎরানি আর গোঙানি। এই অবস্থা যখন চলছে, তখনই ব্যাপারটা প্রথম আপনার নজরে এল।

"এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাপারটা আমি টের পেলাম কি করে। বলছি

শুনুন…আপনার ধারণা হয়েছিল, হয়ত আমেরিকার অনুকরণে কোন লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছে, মুক্তিপণ দিলে তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতে কিন্তু আপনার ও থিওরী টিকল না। প্রথমতঃ, বন্দীই যদি কাউকে করা হয় তবে তো তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই, বন্দীর ওপর কেন ওরা মার-ধর করতে যাবে? বরং তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখাই স্বাভাবিক, ভবিষ্যতে যাতে তার কোন আক্রোশ না থাকে। তার চাইতেও বড় যুক্তি এই যে, বাস্তবিকই অত্যাচার অথবা মার-ধর তারা যদি করেই থাকত তো আমরা—অর্থাৎ আমি আর আপনি—দু'বার ওবাড়ী যাবার পরই তা বন্ধ হয়ে যেত। ইচ্ছে করে কে কবে পাড়া-পড়শীর সন্দেহ জাগাতে চায় বলুন। না, অত বোকা ওরা নয়; সে রকম মৎলব থাকলে অন্যত্র কোথাও সরে পড়তে নিশ্চয়ই। গোলমাল যেটা হয়েছে সেটা ওদের ইচ্ছাকৃত নয়, চেষ্টা করেও সেটা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। বোঝা গেল রহস্যটা অন্য ধরণের। কি ধরণের রহস্য তাও যে একটু একটু আঁচ করতে না পারলাম তা নয়। সেদিন বাড়ীর কর্তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কথা মনে আছে? লোকটা যে ক্রমাগতঃ গেঞ্জীর ডান হাতাটা নীচের দিকে টেনে দিচ্ছিল, ওটা কোন মুদ্রা দোষ নয়—ইঞ্জেক্‌সনের দরুণ হাতের খানিকটা জায়গা ফুলে ঢিবির মত হয়ে উঠেছিল, সেইটাকেই ঢাকবার চেষ্টা। হাতের অবস্থা দেখে আর মুনের পুঁটলিটা পেয়ে যাওয়ায় ওই লোকটাকে যে ইঞ্জেকসন দেওয়া হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। সমস্ত দিন দোতালা থেকে ওই বাড়ীটার চারদিকে আমরা নজর রেখেছি, কাউকে ঢুকতে দেখেনি, তবে ডাক্তার এল কখন? বুঝলাম, গভীর রাত্রের ওই মোটরখানা আর কিছু নয়, ডাক্তার আমদানীর ব্যবস্থা, ব্যাপারটা কেমন আগাগোড়া গোপন রাখবার চেষ্টা হচ্ছে দেখছেন তো! খুব গোপনে তার চিকিৎসা চলছে। কি অসুখ তা তারা কাউকে জানতে দিতে রাজী নয়, কেননা তাতে নাকি তাদের জেল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

"ডাক্তার যখন চিকিৎসা সুরু করেছে আর রোগীর অবস্থার যখন উন্নতি হয়নি—ব্যথা চাপবার চেষ্টা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল—তখন ডাক্তারকে যে ফের আসতে হবে তা বুঝতে কষ্ট হল না। বাস্তবিকই গভীর রাত্রে আবার মোটর এল, সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে খুব ধীরে ধীরে। আমিও নীচে নেমে রাস্তার ধারে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম; তারপর খানিক

বাদে মোটর ফিরে যেতেই পেছন থেকে টর্চের আলো ফেলে গাড়ীর নম্বরটা দেখে নিলাম। ডাক্তারের পাশে গাড়ীতে আর একজন লোক বসে ছিল। গাড়ীর নম্বরটা যে আসল নম্বরই তাতে ভুল ছিল না, কেননা নকল নম্বর হলে
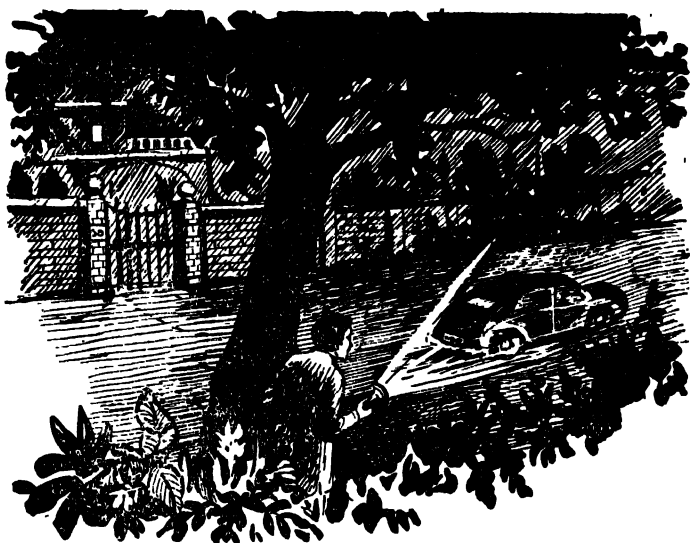
পেছনের আলো নিভানো থাকত না। পরদিন সকালে বেরিয়ে মোটর রেজিস্টার ঘাঁটতেই দেখা গেল ওখানা এই হোটেলের গাড়ী। সেদিনই সকালবেলা আমার হোটেলে উঠে আসতে দেখে আপনি খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন নাকি?

"হোটেলের যে রুমটা আপনার খুব পছন্দ-সই হয়েছিল, আমারও প্রথম নজর পড়েছিল সেইটারই ওপর, এবং যে জবাব আপনাকে দিয়েছি সেটাও ম্যানেজারেরই দেওয়া জবাব। জবাবটা আমারও খুব আশ্চর্য বলে মনে হল— সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে লোকটা করে কি? অপিসে আর কিছু এতক্ষণ খাটায় না। কথা বলতে বলতে ম্যানেজারের সঙ্গে আমি নীচে নেমে এলাম। হঠাৎ ম্যানেজার বলে উঠলেন, 'একি, ও-ঘরের ভদ্রলোক যে আজ এরই মধ্যে ফিরে আসছেন। এইতো সবে বেরিয়ে গেলেন।' তাকিয়ে দেখি একটি লোক স্টেশনের কুলীর হাতে সুটকেশ চাপিয়ে হোটেলের দিকে এগুচ্ছে, খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাব তার মুখে-চোখে।

ম্যানেজারের সামনে এসেই সে বল্লে, 'মোটরখানা আর একবার চাই, ম্যানেজারবাবু, না হলেই নয়, বিশেষ দরকার।'

"ম্যানেজারের অবশ্য গাড়ী দিতে কোন আপত্তি ছিল না, বিল বেশী উঠলে তাঁর আর ক্ষতি কি? কিন্তু ড্রাইভারের আপত্তি দেখা গেল—এই রাত্তিরে সে গাড়ী চালিয়ে এল, আবার এক্ষুনি······। কিন্তু ম্যানেজার ধমকে উঠলেন, 'তাতে কি হয়েছে, দরকার হলেই যেতে হবে।'

"দুটি জিনিস তৎক্ষণাৎ আমার চোখে পরিষ্কার হয়ে গেল, প্রথমতঃ, লোকটা রেলে কোথাও যাবে বলে রওনা হয়েছিল, গাড়ী ফেল করাতে ফিরে এসেছে। নইলে স্টেশনের কুলী পেল কোথা? দ্বিতীয়তঃ, সে বলেছে 'মোটরখানা আর একবারটি চাই' তার মানে, এর আগেই সে আরও একবার গাড়ী নিয়েছে। ড্রাইভার বলছে, এর আগেই তাকে বার হতে হয়েছিল রাত্তিরে। এ থেকে আন্দাজ করতে মোটেই কষ্ট হল না যে আগেরদিনে ১৩ নম্বর বাড়ীতে মোটরে যে দুটি লোক এসেছিল, এ লোকটি হচ্ছে তাদেরই একজন। কিন্তু কোন্ জন—ডাক্তার না তার সহযাত্রীটি? যাইহোক, সম্প্রতি লোকটা কোথায় যাচ্ছে তা জানা এরপর কঠিন হবে না, কেননা ড্রাইভার এখন থেকেই যখন আপত্তি জানাচ্ছে তখন সে ফিরে এলেই ফের তাকে গাড়ী বার করতে বলা যাবে। নিশ্চয়ই সে তখন প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলবে যে এইমাত্র এত দূর থেকে সে ঘুরে এল, এখন আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তখন 'কোথায় গিয়েছিলে?' প্রশ্ন করলেই জায়গাটার নাম বেরিয়ে পড়বে।

"ঠিক সেই মৎলব অনুযায়ীই কাজ করা গেল; ড্রাইভার জানাল, বাবুটিকে সে নৈহাটিতে রেখে এসেছে। অনেক রাত্রে লোকটা আবার হোটেলে ফিরে এল। ভোরে সে যখন ফের বার হচ্ছে তখন আমি তার পিছু নিলাম। শিয়ালদায় এসে দেখি সে নৈহাটিরই টিকিট কাটছে। আমিও চল্লাম সেই সঙ্গে সঙ্গে নৈহাটি। নৈহাটি-জংসনে নেমে সে ধরল কম্বোলি—রোড; আমিও কিছু দূরে সমানে তার পেছু পেছু। তারপর কম্বোলি যে তার দিনের লীলাভূমি এ তথ্যটি নিশ্চিত জেনে আমি ফিরে এলাম কলকাতায়—বেলা প্রায় দশটার সময়।

"এর পর আপনি এলেন আমার হোটেলে আর আমরা দু'জনে রওনা হয়ে গেলাম কম্বোলিতে। এখানে আপনাকে একটু ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি

না, মিউজিয়াম দেখবার অতটা আগ্রহ যদি আপনি প্রকাশ না করতেন তবে রহস্য ভেদ হতে আরও কিছু সময় লাগত। কেননা আমার হোটেলের সেই রহস্যময় লোকটি যে কম্বৌলি মিউজিয়ামেরই একজন কর্মচারী তা তখনও জানতে পারিনি। আমরা যখন ভেতরে যাই তখনও একরাশ ফাইলের সামনে বসে খুব মন দিয়ে একখানা মোটা বই পড়ছিল, তবু তার হুঁসই নাই। দেখলাম ওটা একটা ডাক্তারী বই, যে পরিচ্ছেদটা ও মন দিয়ে পড়ছে সেটা জোলাপ সম্বন্ধে, হঠাৎ আমার উপস্থিতি টের পেতেই ফট্ করে বইখানা বন্ধ করে ধরা পড়া অপরাধীর মত আমার দিকে সে চাইলে। যেন কিছুই দেখিনি এমনি ভাবে মিউজিয়াম সম্বন্ধেই গোটা কতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমি সরে এলাম।

"আমার মনে তখন পর পর কয়েকটি প্রশ্ন জাগল ; এ মিউজিয়ামটি হওয়া অবধি এতকাল সর্বসাধারণেরই এখানে ঢুকবার অধিকার ছিল, কোন পাসের দরকার হত না। হঠাৎ পাঁচ-সাত দিন হল সে নিয়ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ এখানে আর যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মিউজিয়ামে একটা স্পেশাল একজিবিশন চলছিল, বিজ্ঞাপন অনুযায়ী যতদিন সেটা চল্‌বার কথা তার আগেই কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ সব কড়াকড়ির মানে কি? তবে কি কোন দামী জিনিস হালে এখান থেকে চুরি গেছে? নিশ্চয়ই তাই, নইলে কর্তৃপক্ষের এ রকম ব্যবহারের আর কোন দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এ রহস্যময় লোকটি দেখছি এখানকারই কর্মচারী! এ চুরির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই তো? নীচে নেমেই তাই আপনাকে বিদায় দিয়ে আমি মিউজিয়ামের কর্মকর্তা—কিউরেটারের ঘরে ঢুকলাম। অল্প একটু আলাপের পরই দেখা গেল আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি, বাস্তবিকই একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মুক্তার মালা চুরি গেছে। এবার পরের প্রশ্ন; কিউরেটারের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে কেউ ডেলি-প্যাসেঞ্জার নেই, সকলকেই কম্বৌলিতে থাকতে হয়, তাঁর বিনা অনুমতিতে কম্বৌলি ছেড়ে কোথাও কারও যাবার হুকুম পর্যন্ত নেই। অথচ এ লোকটি দেখছি আজ পাঁচ-সাত দিন ধরে রোজই রাত্রের গাড়ীতে গোপনে কলকাতা যাচ্ছে—নৈহাটীর মত অত বড় জংশন স্টেশনে কেই বা কাকে চেনে। কলকাতা সে যাচ্ছে একটা লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তার সেই রোগীটি অসহ্য ব্যথায় দিনরাত পড়ে কাৎরাচ্ছে, অথচ সে ব্যথার কারণ

ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ করবার উপায় নেই, সাধারণ ডাক্তারের কাছেও না। কেননা তা হলে নাকি তাদের সবারই জেল হয়ে যাবে। এখানে হাজার কাজের মধ্যেও এ লোকটা বসে বসে চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই বই পড়ছে—নানা রকম জোলাপ সম্বন্ধে। ওষুধটা যখন জোলাপ, ব্যথাটা নিশ্চয়ই পেটের। পেটের ব্যথার সঙ্গে কোন জিনিস চুরির একমাত্র সম্বন্ধ থাকতে পারে যদি চোরাই মালটা হয় খুব ছোট, আর চোর সেটাকে গিলে ফেলে থাকে। কি অবস্থায় মুক্তোর মালা চুরি হয়েছিল কিউরেটার তা বলেছিলেন, শুনে আর কোন সন্দেহই রইল না যে আপনার প্রতিবেশী ওই তের নম্বরের ভাড়াটেই মালা চোর—চুরির পরেই বেগতিক দেখে সেটা গিলে ফেলেছে। কিউরেটারকে তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলে বিদায় নিলাম। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত তা তো দেখতেই পাচ্ছেন—আমি চলে আসতেই কিউরেটার কলকাতায় পুলিসের কাছে ফোন করেছিলেন, তারা লোকটাকে মেডিকেল কলেজে ধরে নিয়ে গেছে, আর সেখামে এক্স-রে করতেই ওর পেটের ভেতর মুক্তোর মালাটির সন্ধান মিলে গেছে।"

॥ তিন ॥

হীরক-রহস্য

বেলা তখন আন্দাজ একটা ; খাওয়া-দাওয়ার পর হুকা-কাশির বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে ছিলেন। এমন সময় বেহারা অমৃত একখানা ভিজিটিং-কার্ড আনিয়া উপস্থিত করিল। একবার সেদিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন নামটা অচেনা। "সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে এসো" বলিয়া খবরের কাগজখানা তিনি এক পাশে সরাইয়া রাখিলেন।

একটু পরেই প্রৌঢ়-বয়সী যে বাঙালী ভদ্রলোকটি ভিতরে ঢুকিয়া হুকা-কাশিকে অভিবাদন জানাইলেন, তাঁর পানে মুহূর্তকাল তাঁকে নির্ণিমেষে তাকাইয়া থাকিতে হইল। বাস্তবিকই কার্ডে লেখা নামটা আগে হইতে দেখা না থাকিলে ইনি যে বাঙালী তা বুঝিতে হুকা-কাশির মত লোকেরও কষ্ট হইত। প্রায় সাহেবের মতই ধবধবে রং, পা হইতে গলা অবধি নিখুঁত সাহেবী পোষাক, চলিবার এবং কথা বলিবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত সাহেবী ধরণের।

ভদ্রলোকের মুখখানা কিন্তু বড়ই মলিন, চোখে দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। আগন্তুকটিই প্রথম আলাপ শুরু করিলেন, বলিলেন, "আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমাদের ফার্মটার নাম সম্ভবতঃ আপনি শুনেছেন।"

"কোন্ ফার্ম ?" হুকাকাশি প্রশ্ন করিলেন।

"সেন এণ্ড সরকার লিমিটেড—জুয়েলার্স।"

হ্যাঁ, এ নাম হুকাকাশি শুনিয়াছেন বটে। সাধারণতঃ জুয়েলার্স বা মণিকার বলিতে যা বুঝায় ইহারা তা হইতে একটু স্বতন্ত্র রকমের। অবশ্য হীরা-জহরৎ এঁরাও বেচেন বটে, কিন্তু কারবারের প্রধান কাজ হীরা পালিশ এবং কাটাই করা। কিছুদিন হইল এঁরা দমদমে ছোটখাটো একটা কারখানা খুলিয়াছেন, সে খবরও হুকাকাশি রাখেন। ঠিক বিলাতী কায়দার না হইলেও কারখানাই বটে।

আগন্তুক—তাঁর নাম মিস্টার সেন—আবার কহিলেন, "আমিই এ কারবারের সিনিয়ার পার্টনার (প্রধান অংশীদার)। হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডামে কুড়ি বছর হাতে কলমে কাজ শিখে এসে এখানে ব্যবসার পত্তন করেছি। কাজকর্ম চলছিলও ভালোই কিন্তু মিস্টার হুকাকাশি, হঠাৎ আমার এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে।"

হুকা-কাশি একটু নড়িয়া চড়িয়া বলিলেন, "সব কথা আমায় খুলে বলুন।"

"বিঘাউনির রাজার নাম শুনেছেন, বোধ করি, তিনি আমাদের একজন বাঁধা খদ্দের। দিন কতক আগে তাঁর কাছ থেকে একখানা হীরা আসে, সেখানাকে হাল-ফ্যাসান অনুযায়ী কেটে পালিশ করে দিতে হবে। কালকে কারখানায় আমাতে আর আমার পার্টনার সরকারেতে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়; হীরাখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি বেশ করে দেখিয়ে দিই যে কি ভাবে কাটলে ওখানার জৌলশ সব চাইতে বেশী খুলবার সম্ভাবনা। ঠিক হল, আমার উপদেশ মত, আমার সম্মুখে আজ ওটা কাটা হবে। কাল আমার সময় ছিল না, কাজের তাড়ায় বার হতে হয়েছিল। দিনের শেষে কাল যখন কারখানা বন্ধ করা হয় তখনও ওখানা ঠিক জায়গাতেই ছিল। তারপর হীরার কেস বন্ধ করে চাবি দেওয়া হল। কিন্তু আজ কারখানায় এসে দেখতে পেলাম কেসে হীরাখানা নেই, তার খোলটা খালি পড়ে রয়েছে—অর্থাৎ রাত্তির বেলায় হীরাটি চুরি গেছে। অথচ কি ভাবে যে হীরা চুরি

যেতে পারে আকাশ-পাতাল ভেবেও আমরা তার কোন কুল-কিনারা পাচ্ছি না। সমস্ত কারখানাটির একটি বর্ণনা দিলেই ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারবেন। যে প্রকাণ্ড হলঘরটাতে আমাদের কাজ হয়—হীরা থাকে—সেটা থেকে বাইরে বেরোবার একটি মাত্র দরজা, সারা ঘরে আর দ্বিতীয় দরজা নেই। ল্যাচ্ কী দিয়ে সে দরজা খোলা হয়, বন্ধও হয় সেইভাবেই। আমার আর মিঃ সরকারের হাতেই শুধু তার চাবি, আর কারো হাতে সে চাবি কখনই পৌছুতে পায় না। দরজার পরেই বাইরে শক্ত লোহার কোলাপ্-সিবল গেট, তারও চাবি শুধু আমাদের দু'জনার কাছে। কারখানা ছুটি হলে প্রত্যহ আমি নিজে হাতে প্রথমে ভেতরের দরজা, তারপর কোলাপ্সিবল্ গেট বন্ধ করে দিই। হলের ভেতর আলো আসবার জন্য অনেকগুলি জানলা অবশ্য রাখতে হয়েছে, তবে সেগুলো মানুষের নাগালের অনেকখানি উঁচুতে। সবগুলো জানলাতেই প্রথমতঃ মোটা মোটা লোহার শিক, তার ওপর আগাগোড়া মিহি তারের জালে ছাওয়া। মাছিটিরও গলবার জো নেই। জান্লার পাল্লা আগাগোড়া লোহার, কাজ বন্ধ হয়ে গেলে ভেতর থেকে সেগুলো এঁটে দেওয়া হয়। ঘরের ভেতর কাজ চলবার সময় যে-সব আবর্জনা জঞ্জালের সৃষ্টি হবে তা পর্যন্ত একটু নড়চড় হবার উপায় নেই। হলের সঙ্গে লাগানো চৌবাচ্চার মাপের প্রকাণ্ড উঁচু আর একটা ঘর আছে—শুধু একটা নর্দমা দিয়েই হলঘরের সঙ্গে তার যোগাযোগ। এটাকে আমরা বলি চৌবাচ্চা-ঘর। ঐ নর্দমা পথে সমস্ত জঞ্জাল চৌবাচ্চা-ঘরে এসে জড় হয়ে। এই চৌবাচ্চা ঘরে ঢোকবারও শুধু একটিমাত্র দরজা, চাবি থাকে কেবল আমার আর মিঃ সরকারের কাছে। আমরা দু'জনা ছাড়া এ ঘরে অন্য কারো ঢুকবারই হুকুম নেই। রোজ বিকাল পাঁচটায় কারখানা বন্ধ হলে আমি এসে জঞ্জালগুলো পরীক্ষা করে দেখে আবার বন্ধ করে চলে যাই। হলঘরে তবুও জানালা রয়েছে, এখানে সে বালাইও নেই, থাকবার মধ্যে আছে কেবল বাতাস প্রবেশের জন্য ছাতের কাছাকাছি দেওয়ালের গায়ে দুটো ছোট ছোট ফোকর—মোটা শিক সেখানেও এমনিভাবে বসানো যে মানুষের সাধ্য কি সেখানে কোন রকম দন্তস্ফুট করে। মেঝের ওপর থেকে চৌবাচ্চা-ঘরের ছাদ চৌদ্দ ফুট। দিন রাত বন্দুক-কাঁধে বরকন্দাজ পাহারা দিচ্ছে—একজন চৌবাচ্চা-ঘরের কাছে, একজন ঠিক তার উল্টো দিকে। একতলায় কারখানা, দোতলায় আমার কোয়ার্টার। আজ বেলা দশটায় কারখানা খোলবার সময়

বরাবরকার মতই বিশেষ লক্ষ্য করে গেছি, দরজা-জানলা কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগ নেই। হীরার কেসগুলোও দিব্যি তালাবন্ধই আছে। কাজেই কি ভাবে যে হীরাখানা খোয়া যেতে পারে তা বাস্তবিকই একটা প্রকাণ্ড রহস্য। আপনি হয়তো বললেন, কাজ করাবার সময় কারিগরদের ভেতরেই কেউ হয়তো এ দুষ্কর্মটি করেছে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, মিঃ হুকা-কাশি, তা একেবারেই অসম্ভব। অসম্ভব এই জন্য যে আমাদের ওখানকার নিয়মই হ'ল এই, যে একবার কাজের ঘরে ঢুকলে কারখানা বন্ধ হবার আগে আর কেউ সে ঘর থেকে বাইরে আসতে পাবে না। টিফিনের সময়ও জলখাবার খেতে হবে ঐ ঘরেরই ভেতরে—যার যা খেতে অভিরুচি বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে। ঘরের এক পাশে কাঠের পার্টিশন দিয়ে জলের কল, বাথরুম সমস্তই করে রাখা হয়েছে। বাইরে আসবার কোন দরকার নেই। কাজের ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একমাত্র ভিতর-দরজাটা আমরা বন্ধ করে দিই, আর সেই বন্ধ দরজার এ পাশে সারাক্ষণ একটা দরোয়ান মোতায়েন থাকে। মিঃ সরকার এবং আমি ছাড়া সারা দিনে ও ঘরে আর কোনও প্রাণীর ঢোকবার উপায়ও নেই, হুকুমও নেই। তারপর ছুটির ঘণ্টা বেজে গেলে কারিগরদের একে একে দরজার সামনে আনা হয়, তন্ন তন্ন করে তাদের দেহ তালাস করে তবে আমি ফটকের বাইরে যেতে দিই। বিশ বছর আমস্টর্ডামে চাকরী করে এসেছি, হীরা সরিয়ে নেবার যত রকম সম্ভব-অসম্ভব ফন্দি-ফিকির আছে কোনটাই আমার জানতে বাকী নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার চোখে ধুলো দিয়ে কেউ যে সরে যেতে পারেনি, এ কথা ধ্রুব সত্য। আর তাছাড়া তার তো প্রত্যক্ষ প্রমাণই রয়েছে—দিনের শেষে কেস বন্ধ করবার সময় হীরা তো কেসেই ছিল দেখা গেছে! এক ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া এ রহস্যের তো আর কোনও সমাধানই আমি দেখতে পাই না। অথচ সময়মত রাজা বাহাদুরকে তাঁর হীরা ফিরে দিতে না পারলে আমাদের দশা কি হবে একবার ভেবে দেখুন আপনি।"
ভদ্রলোক হাতের তেলোর ওপর কপালের ভর রাখিয়া ম্রিয়মানভাবে মেঝের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

হুকাকাশি ধীরে ধীরে এক টিপ নস্যি লইয়া কহিলেন, "হুঁ, হীরা চুরির ব্যাপারটা আজকাল কলকাতায় একটু সংক্রামক হয়ে দেখা দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি। শুধু আপনি নন, আরও দু'একজন মণিকার এ বিষয়ে আমার পরামর্শ

চেয়ে পাঠিয়েছেন।...আচ্ছা আপনি এখন দমদমায় ফিরে যান, ঘণ্টাখানেক বাদেই আমি আসছি।"

মিস্টার সেন গিয়া মোটরে উঠিতেই হুকাকাশি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলিয়া লইলেন, "হ্যাল্লো......কে রণজিৎবাবু? ভারী ইন্টিরেস্টিং—আর একটা হীরা চুরির কেস! হ্যাঁ, এবারে দম্‌দমার সেন এণ্ড সরকার কোম্পানী থেকে। হাতে সময় আছে? একবারটি যেতে পারবেন আমার সঙ্গে ওখানে? আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছেন? আচ্ছা, আমি তাহলে তৈরী হয়ে থাকি।"

যথা সময়ে রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া হুকাকাশি দম্‌দমার সেন এণ্ড সরকারের কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিঃ সেন ফটকের সামনেই অপেক্ষা করিতে ছিলেন, অল্প পরে মিঃ সরকারও আসিয়া জুটিলেন। হুকাকাশি বলিলেন, "সময় নষ্ট না করে প্রথমেই চলুন অকুস্থানে যাওয়া যাক, মানে যেখান থেকে হীরাখানা অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখানে।"

দরজা খোলা হইল, চারিজনেই প্রকাণ্ড হলটার ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। সে সময়টা টিফিনের, কারিগরেরা কাজকর্ম ছাড়িয়া ঘরের মধ্যেই যে যার টিফিন খাইতে বসিয়া গেছে—কেউ টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি হইতে রুটি-তরকারি বাহির করিতেছে, কেউ বা গুড় সহযোগে চিড়া চিবাইতেছে। কারো কারো আবার স্বাস্থ্যকর জিনিষের ওপর ততটা লক্ষ্য নাই, মুখরোচক হইলেই হইল। তারা ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলিয়া বাহির করিতেছে ঝুরিভাজা। কেউ বা দুনিয়ার একমাত্র সার বস্তুটাকেই শুধু চিনিয়াছে, অর্থাৎ সেই প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও থার্মোফ্লাস্ক খুলিয়া গিলিতেছে কেবল বাটি বাটি চা। রণজিৎ একটু হাসিয়া মিঃ সেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "নাঃ, আপনার কারিগরদের ভোজন-বৈচিত্র্য আছে বলতেই হবে; কেউ কেউ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেজায় সতর্ক, আবার কেউ কেউ সে বিষয়ে কোন তোয়াক্কাই রাখে না।"

হুকাকাশি টিপ্পনী কাটিলেন, "অর্থাৎ খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ, এই তো? কিন্তু কেউ কেউ আবার বিশেষ অজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ—দুই-ই। ঐ দেখুন, পাছে বাতাস লেগে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে ওই লোকটা খাবারের বাক্সে ছোট ছোট কতকগুলি ফুটো করে নিয়েছে। অথচ খাবার বেলায় খাচ্ছে তেলেভাজা বেগুনি—এক কথায় যাকে সত্য বিষ বললেই চলে!"

মুখে রসিকতা করিতে থাকিলেও হুকাকাশি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত ঘরখানাই

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিতে ছিলেন ; গলায় স্বর নামাইয়া বলিলেন, "বাস্তবিকই আপনারা একটি অভেদ্য দুর্গই তৈরী করে রেখেছেন, মিঃ সেন। কোন বাইরের লোকের পক্ষে এখানে ঢুকে কোন কিছু সরিয়ে নেওয়া যেমন অসম্ভব ; তেমন ভেতর থেকেও যে-কোন লোকের পক্ষেই বাইরে কোন জিনিষ চালান দেওয়াও দুঃসাধ্য ব্যাপার ! ওপরের ওই জানলার পাল্লাগুলি তো দেখছি খাঁটি স্টীলের। কাজ বন্ধ হয়ে গেলে নিশ্চয় ওগুলোকে ভেতর থেকে এঁটে দেওয়া হয়।......এই গুলোই বুঝি হীরার কেস ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, এগুলোও খাঁটি স্টীলেই তৈরী। কেসের ভেতর প্রত্যেকটি হীরার জন্য আলাদা আলাদা খোপ আছে, গায়ে নম্বর আঁটা। এখন কাজ চলছে, তাই কেসের ডালা খোলা, মিঃ সরকার এগুলোর কাছে কাছেই থাকেন। ছুটির সময় প্রত্যেকটি খোপে হীরা আছে কিনা দেখে নিয়ে ডালা বন্ধ করে চাবি এঁটে দেবেন। তার মানে লোহার সিন্ধুকের মধ্যেই এগুলো রাখা হল।"

"বুঝেছি, এখন চলুন, পার্টিশনটার ওধারটা একবার দেখে আসা যাক। বাঃ, এদিকেও তো দেখছি আপনাদের সতর্কতার সীমা নেই—একেবারে দুর্গ।" পার্টিশনের এধারে আসিয়া হুকাকাশি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আপনার কারিগরেরা কি মাঝে মাঝে খিচুড়ী দিয়েও টিফিন করে নাকি মিঃ সেন ?"

"খিচুড়ী ? কই, দেখিনি তো কখনও। তা খেতে পারে, আশ্চর্য কি ?"

"আমি কিন্তু রান্নাকরা খিচুড়ীর কথা বলছি না—কাঁচা খিচুড়ী।"

"কাঁচা খিচুড়ী ! সে আবার কি ?"

"নইলে এগুলো এখানে এলো কোত্থেকে ? এই দেখুন।" বলিয়া তিনি গুটিকয়েক ডাল এবং চাল মেঝে হইতে তুলিয়া মিঃ সেনের হাতে দিলেন।

এগুলির দিকে কিন্তু আর কারোরই নজর পড়ে নাই। সেন এবং সরকার পরস্পরের দিকে তাকাইয়া মুখ চাওয়া-চাওই করিতে লাগিলেন, ব্যাপারটা তাঁদের কিছুই বোধগম্য হইল না। কিন্তু হুকা-কাশির আর তখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, একখানা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ততক্ষণ তিনি ঘরের মেঝে পরীক্ষা করিতে বসিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ রণজিৎকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন তো রণজিৎবাবু, মেঝের ওপর ছড়ান এগুলো কি ?"

রণজিৎ খানিকটা দেখিয়া নিয়া কহিল, "এতো দেখছি বালি।"

"কিন্তু সাধারণ বালি নয় নিশ্চয়ই। না না, হাতে করে অত জোরে রগড়াবেন না, কি রকম খরখরে দেখছেন তো, হাত ছড়ে যাবে যে!"

মিঃ সেনেরও কৌতূহল হইয়াছিল, হাতে করিয়া জিনিষটা তুলিয়া নিয়া কহিলেন, "এ তো দেখছি কাঁচের গুড়ো, কারখানায় এ জিনিষ আনলে কে?"

হুকাকাশি বলিলেন, "আমার এদিকটা দেখা হয়ে গেছে, আর কোন জায়গা যদি দেখাবার থাকে তো চলুন মিঃ সেন।"

"আর কোন জায়গা?"

"সবই যখন দেখা হল, তখন আপনাদের চৌবাচ্চা-ঘরটাই বা বাদ যায় কেন? চলুন ওটাও দেখে আসি।"

হল হইতে বাহির হইয়া সকলে চৌবাচ্চা ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিঃ সেন পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া দরজাটি খুলিয়া দিলেন—ভিতরে এত অল্প জায়গা যে চারিজন লোকের স্থান সংকুলান হওয়াই শক্ত; তার উপর আলোর অভাবও যথেষ্ট। মিঃ সেন পকেট হইতে খুব দামী একটা টর্চ বাহির করিয়া এধার ওধারে টর্চের তীব্র আলোক ফেলিতে লাগিলেন। এক কোণে ছোট্ট সাদা মত কি একটু জিনিষ দেখা গেল; আঙুলে করিয়া সেটুকু তুলিয়া আনিয়া মিঃ সেনকে হুকাকাশি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন তো, এটা কি আপনাদের হীরা কাটার কোন কাজে আসে?"

মিঃ সেন দুই হাতে জিনিষটা একটু কাল নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন, "এতো দেখছি তুলো, কিন্তু সাধারণ তুলো এতো নয়, এ যে প্রায় রেশমের সামিল—এ আমাদের কারখানায় ঢুকলো কোত্থেকে?"

"ঠিক বলেছেন, কাঁচের গুড়োও যেমন অসাধারণ তুলোও ঠিক তাই! বাজারে এ ধরণের তুলো আপনি কিনতে পাবেন না। চলুন, এবারে বার হওয়া যাক, আমার কাজ হয়ে গেছে।"

দরজা বন্ধ করিতে করিতে মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কিছু আঁচতে পারছেন?"

"তা পারছি বইকি, বারো আনা রহস্যই পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

"বটে নাকি?" মিঃ সেন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, পলকের জন্য আশার আলোকে তাঁহার সমস্ত মুখ ভরিয়া উঠিল, কহিলেন, "মহারাজের হীরা তবে ফিরে পাবার সম্ভাবনা আছে?"

"তা নেই, একথাই বা বলি কি করে! কাল আর আমার দেখা হয়ত আপনি পারেন না, তবে পরশু নাগাদ আমার কাছ থেকে একটা টেলিফোন আপনি আশা করতে পারেন। এখন যাবার আগে একটা কথা—কারখানা-ঘরের দরোয়ানটাকে আমি একটু আড়ালে ডেকে গুটি দুই প্রশ্ন করতে চাই, অবশ্য আপনাদের যদি তাতে কোন আপত্তি না থাকে।"

"সে কি কথা, আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন, আমাদের আবার কি আপত্তি।"

"বেশ, তবে চলুন এবার তার কাছে আমায় নিয়ে।"

হুকাকাশি ঠিকই বলিয়াছিলেন, বাস্তবিকই পরদিন সারাবেলা তাঁর আর কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না। তারপর সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তিনি ঝড়ের মত রণজিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত, কহিলেন, "চট করে জামাটা গায়ে চড়িয়ে নিন্ তো রণজিতবাবু, একবার 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' আপিসে যেতে হবে।"

"কেন? সেখানে কি দরকার?"

"ডাট এণ্ড ডাট জুয়েলার্স একটা বিজ্ঞাপনের কপি আমার হাতে দিয়েছে, কালকের 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' পত্রিকায় সেটা বার হওয়াই চাই। আমার কথায় এত দেরীতে ওরা যদি বিজ্ঞাপনের কপি নিতে আপত্তি করে, তাই আপনাকে সঙ্গে নেওয়া। খবরের কাগজ-মহলে আপনার খুব খাতির, আপনার অনুরোধ ওরা কেউ ঠেলতে পারবে না।"

খবরের কাগজের আপিস হইতে বাহির হইয়া হুকাকাশি আবার ডুব মারিলেন, পরদিন বিকাল পর্যন্ত আর তাঁর কোন খবরাখবর নাই। রণজিৎ অদম্য কৌতুহল চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া অনবরত ঘর বার করিতেছিল, এমন সময় ক্রিংক্রিং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া সে রিসিভারটা কানে লাগাইল; তারপর চোঙ্গার কাছে মুখ লাগাইয়া বলিল, "হ্যাল্লো, ওঃ মিস্টার হুকাকাশি? খবর কি? আমার আর আপনার দু'জনারই সন্ধ্যার পর মিঃ সেনের ওখানে নেমন্তন্ন? হঠাৎ এত আন্দোৎসবের কারণ কি? বলেন কি, বিঘাউনি-রাজের হীরার উদ্ধার এর মধ্যেই হয়ে গেছে? আপনি মানুষ নন মিস্টার হুকাকাশি, কিছুতেই মানুষ নন্—হ্যাঁ অপদেবতা, তাই বটে! আমায় ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাবেন? আচ্ছা!"

রণজিৎ ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠিলে হুকাকাশি বলিতে সুরু করিলেন, 'একেবারে বৈজ্ঞানিক চুরি মশাই, এদেশে এমনতর ব্যাপার বড় দেখা যায় না। অক্ষয়-নামে এক নামজাদা ঝানু জোচ্চোর সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়ে এক নতুন ধরণের জোচ্চুরি শুরু করেছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্ণের অনেকগুলো নকল হীরা জোগাড় করে—সে সব কোথায় পাওয়া যায় আপনি না জানলেও জোচ্চোরেরা তার খবর রাখে—সে কলকাতার দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াত। খদ্দের সেজে দোকানের কাউণ্টারের ওপর হীরা পরখ করবার ছুতোয় নকল হীরা বাক্সে চালান দিয়ে, আসলখানা বার করে এনে বলত, 'না মশাই, পছন্দ হল না।' তারপর দোকানীর চোখের সামনেই খুট করে বাক্সটা টিপে দিয়ে চলে আসত। চোখের সামনে হীরা বন্ধ করা হয়েছে দেখে দোকানীর আর কোন সন্দেহ হত না। তারপর আসল ব্যাপারটি যখন খোলসা হত তখন খদ্দের একদম ভেগে পড়েছে। এই রকম বার দু'তিন ঘটতেই মণিকার-মহল সাবধান হয়ে গেল। দু'একজন আমাকেও খবর দিলে। অক্ষয়ও বুঝল, ঘন ঘন এক ফিকির বেশীদিন চালান নিরাপদ নয়, একটু অন্যপথে যাওয়া দরকার। হঠাৎ তখন তার মনে পড়ল সেন এণ্ড সরকার কোম্পানীর কথা। শোনা যায় ওদের হীরা নাকি বাজার চলতি হীরার চাইতে ঢের ঢের বেশী দামী। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেখতে ক্ষতি কি? টাকা কব্‌লে বনমালী নামে সেন এণ্ড সরকার কোম্পানীর এক করিগরকে অক্ষয় হাত ধরে ফেল্লে। এবার প্ল্যান হল সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। ঝানু জোচ্চোর কিনা, হরেক রকম জোচ্চুরিরই সাজ-সরঞ্জাম ওর কাছে আছে। এই সরঞ্জামের মধ্যে আছে গুটি কয়েক শেখানো পায়রা। আপনি নিশ্চয় জানেন শিক্ষিত পায়রাকে কোন জায়গা থেকে ছেড়ে দিলে সে উড়ে গিয়ে ঠিক তার মালিকের বাড়ীতেই হাজির হবে। আগেকার দিনে সেনাপতিরা এদের পায়ে চিঠি বেঁধে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানীতে পর্যন্ত খবর পাঠাতেন। এ রকম একটি শেখানো পায়রা বনমালীকে দেওয়া হল। সেন এণ্ড সরকারের কারখানা-ঘরে কর্মচারীদের ঢোকবার বেলায় কোন রকম 'দেহ-তালাস' করা হয় না, কেননা তা অনাবশ্যক, ওটা করা হয় শুধু বার হবার সময়তেই। বনমালী তার টিফিনের বাক্সে হাওয়া চলাচলের উপযোগী গুটিকয়েক ছ্যাদা করে পায়রাটিকে তারই ভেতর পুরে ফেল্লে, তারপরে টিফিন বলে চালিয়ে বাক্সটাকে নিয়ে এলো কারখানা-ঘরের মধ্যে।

ভেল্কিওয়ালার পায়রার মত অক্ষয়ের পায়রাও ডাকে না, চুপচাপ পড়ে থাকে। বনমালী আগেই খবর পেয়েছে পাকা জহুরী মিঃ সেনের উপস্থিতি ছাড়া বিঘাউনি-রাজের হীরা কাটা হবে না, আর সেদিনই টিফিনের সময় মিঃ সেনকে কাজের তাগাদায় বেরুতে হবে ; ফিরবেন তিনি কারখানা বন্ধ হবার সময়—'দেহ-তালাসী' করতে। কাজেই টিফিনের পরই সে সুযোগ বুঝে অক্ষয়ের দেওয়া একখানা যুৎসই নকল হীরা কেসে রেখে আসল হীরাখানা তুলে নিল। যেমন গহনাগাটির দোকানে সচরাচর হয়ে থাকে—কাজের খাতিরে সকলকেই সর্বদা কেসের কাছে যেতে হচ্ছে, সন্দেহের কোনই কারণ নেই। পার্টিশনের এধারে বাথরুমে এসে অন্যের অলক্ষ্যে পায়রার পায়ে বিঘাউনি-রাজের হীরা বেঁধে দিতে তার কোনই কষ্ট হয়নি। তারপর বাক্সে ফের পায়রা পূরে সে
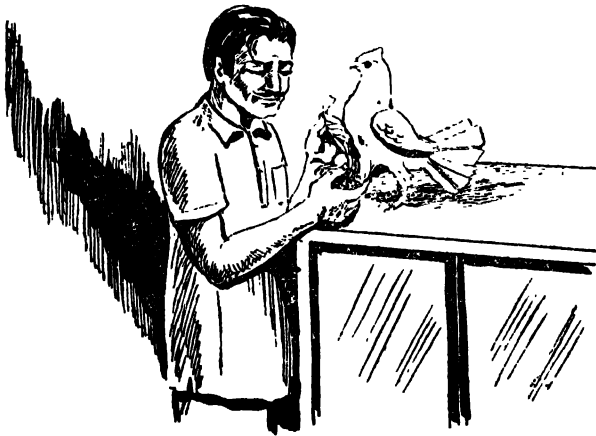
আবার চলে এলো হল-ঘরে, যেখানে জঞ্জাল ফেলবার নর্দমা ঠিক তারই মুখে। এ নর্দমাটিরও সর্বদাই ব্যবহার হচ্ছে, কাজেই হুঁসিয়ারির সঙ্গে চারদিক দেখে নিয়ে কৌশলে সে যখন পায়রাটিকে এই নর্দমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলে তখনও কারো কোন সন্দেহ হবার কারণ ঘটেনি। পায়রা এসে পড়ল চৌবাচ্চা-ঘরে ; সে ঘরের খুব উঁচুতে আলো ঢুকবার ফোকরগুলিতে মোটা মোটা লোহার শিক লাগানো। চোর আটকাবার পক্ষে তা পর্যাপ্ত বটে, কিন্তু পায়রার পক্ষে সে পথে গলে যাওয়া কিছুই কষ্টকর নয়। শিক্ষিত পায়রা সেই পথেই উড়ে এসে অক্ষয়ের হাতে বিঘাউনি-রাজের হীরা পৌঁছে দিলো।

"এদিকে এক মুহূর্তও হীরার খোপ খালি পড়ে থাকেনি বলেই ওদিকে কারুর নজর যায়নি, আর বনমালীও এতটা সাহস পেয়েছিল। ছুটির সময় প্রত্যেকটি খোপই ভর্তি আছে দেখে মিঃ সরকারও কিছু খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যকও মনে করেন নি, কেস বন্ধ করে ফেলেছেন। সকলেরই ধারণা বিঘাউনি-রাজের হীরা সারারাত কেসেই ছিল।

পরদিন বনমালী এসে প্রথমেই সেই নকল হীরা, মানে কাঁচের টুকরোটা কেস থেকে তুলে এনে পেষাই-কলে ফেলে এক মুহূর্তে বালির মত মিহি করে ফেললে। তারপর সেই কাঁচের গুঁড়ো পার্টিশনের ওধারে ফেলে দিল—যাতে জলের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়িতে কাজ সারতে যাওয়ায় অল্প একটু গুঁড়ো কিন্তু মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল। নকল হীরাটাকে এভাবে নষ্ট করার অর্থ এই যে, মিঃ সেনের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাবে রাত্তিরেই বাইরের কোন চোর এসে বিঘাউনি-রাজের হীরাখানা আত্মসাৎ করেছে, ভেতরের কোন কারিগরের এর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। অর্থাৎ একদম উল্টোদিকে অনুসন্ধানের মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়া।"

রণজিৎ অবাক হইয়া সমস্ত ঘটনা শুনিতে ছিল, হুকাকাশির বর্ণনা শেষ হইয়া যাওয়ার পরও সে একটুকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, "বাস্তবিক, এ যে আপনি কি করে বার করলেন ভেবে ভেবে কিছুই কুল-কিনারা পাচ্ছি না।"

হুকাকাশি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা শুনুন তবে, কুল-কিনারা পাইয়ে দিচ্ছি।...

"সেন এণ্ড সরকার কোম্পানীর কারখানায় এসে গোড়াতেই একটা জিনিষ একদম পরিষ্কার হয়ে গেল—রাত্রিযোগে বাইরের কোন চোর ভেতরে এসে যে হীরা চুরি করেনি সেটা সুনিশ্চিত। এমন একটা সুরক্ষিত দুর্গে তাদের আসাই যে শুধু দুরূহ ব্যাপার তাই নয়, দরজা অথবা জানালা কোথাও তাদের আসবার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, এমন কি হীরার কেসটি পর্যন্ত বন্ধ অবস্থাতেই দেখা গেছে। কাজেই প্রথম হতেই সে সম্ভাবনাটা একদম বাতিল করে বিচারের বিষয়টি সীমাবদ্ধ করে আনলাম।

বাইরে থেকে কেউ যখন আসেনি তখন নিশ্চয়ই ভেতর থেকে হীরা

চালান দেওয়া হয়েছে। কারখানা ঘরটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে এও বেশ বোঝা যায় যে হীরা তো দূরের কথা, একটা মাছি গলান যেতে পারে এমন ফাঁকও কোথাও নেই, বাদ শুধু ঐ নর্দমাটা। শুধু ঐ নর্দামার পক্ষেই হীরা আসতে পারে হলঘর থেকে চৌবাচ্চা-ঘরে। কাজেই নর্দমাটাই হবে আমার অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য। বিচারের বিষয় আরও সীমাবদ্ধ হয়ে এল।

"তারপর বিবেচ্য, চৌবাচ্চা-ঘরে মিঃ সেন ভিন্ন আর কারো ঢোকবার উপায় নেই, কাজেই সেখান থেকে হীরাখানাকে ফের কোথাও চালান দিতে হলে তার একমাত্র পথ—প্রায় চৌদ্দ ফুট উঁচুতে আলো বাতাস ঢোকবার উদ্দেশ্যে লোহার শিক দেওয়া যে দুটো ফোকর রয়েছে তারই কোনও একটা। এ অবস্থায় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে হীরা চালান দেওয়া কোন লোকের পক্ষে শুধু নিজের চেষ্টায় অসম্ভব, হয় তাকে কোন যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে, নতুবা কোন জীবের। এতখানি বোধসম্পন্ন যন্ত্র থাকতে পারে বলে আমি নিজে বিশ্বাস করি না, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকই বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না। কাজেই সাহায্য নেওয়া হয়েছে নিশ্চয় কোন জীবের। সে জীবটি এত ছোট হওয়া চাই যে একটা নর্দমার পথ দিয়ে অনায়াসে সে গলে যেতে পারে, একটা টিফিন বইবার বাক্সে করে অনায়াসে তাকে কারখানা-ঘরে আনা চলে, কেন না ও-ভাবে আনা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই তাকে কারখানা-ঘরে আনা সম্ভব নয়। কাজেই অন্য সব চিন্তা ছেড়ে আমায় শুধু দেখতে হবে ঘরের কোথাও এ হেন কোন জীবের কিছুমাত্র চিহ্ন পড়ে আছে কিনা। বিচারের বিষয়টা কতখানি ছোট্ট হয়ে গেছে লক্ষ্য করেছেন?

"ঘরে ঢুকেই একজন কারিগরের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্বন্ধে আমি একটু কটাক্ষ করেছিলাম মনে আছে? খাবার নষ্ট হবার ভয়ে খাবারের বাক্সে ছোট ছোট ছ্যাদা করে নিয়েছিল বলে! খাবার টাটকা রাখবার উদ্দেশ্যে এ কাজ সে করেছে এ কথা কিন্তু তখনও বিশ্বাস করিনি, ঘোরতর সন্দেহ হয়েছিল যে জীবটিকে বাক্সে পোরবার পর তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া সরবরাহের জন্যই এ ব্যবস্থা। পার্টিশনের এ পাশে এসে মেঝের ওপর চাল আর ডাল দেখতে পেয়ে আপনারা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, আমি কিন্তু হইনি। এগুলো সে জীবটিরই খাবার—এ পাশে এনে তাকে খোলবার সময় বাক্স থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে তা আমি তক্ষুনি বুঝতে পেরেছিলাম। কি ধরণের জীব, খাবার

দেখে তাও কিছুটা আন্দাজ হল—যদিও আমার মনে মনে ঐ রকমেরই ধারণা ছিল।

"তারপর চৌবাচ্চা-ঘরে তুলো জাতীয় জিনিষটা দেখে মিঃ সেনের মনেও সন্দেহ হয়েছিল যে সাধারণ তুলো ওটা নয়। আমি কিন্তু তখনই বুঝতে পেরেছি—সাধারণ অসাধারণ কোন তুলোই ওটা নয়, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ, একটা সাদা পায়রার পালক। নর্দমার পথে ঘষা-ঘষিতে পায়রার রোঁয়া ওপর-ওপর উঠে এলে সেটা ঠিক রেশমী তুলোর মতই মনে হওয়ার কথা। সমস্ত ব্যাপারটার তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল—পায়রার পায়ে বেঁধে কারখানারই একজন কারিগর হীরা চালান দিয়েছে; এবং সে কারিগরটি কে তা আঁচতেও কষ্ট হল না—ছ্যাঁদাওয়ালা খাবারের বাক্সের মালিক যিনি, তিনিই—অর্থাৎ খাঁকি হাফপ্যাণ্ট পরা লোকটা।

"পার্টিশনের ওধারে মেঝের ওপর আরও একটি রহস্যময় জিনিষ পাওয়া গেল, মিঃ সেন ঠিকই এঁচেছিলেন, ওগুলো সত্যিই কাঁচের মিহি গুঁড়ো, হীরার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, থাকলে মিঃ সেনের মত পাকা জহুরী কখনই ভুল করতেন না। কাঁচের গুঁড়ো তাঁর কারখানায় কি করে এলো ভেবে মিঃ সেন আশ্চর্য হচ্ছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ব্যাপারটাতো এই—কোন কারণে হীরা চোরের একখণ্ড কাঁচ কারখানার ভেতরে আনার দরকার হয়েছিল, তারপর দরকার চুকে গেলে সেটাকে আর কোন-মতে লুকোবার উপায় নেই দেখে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে!

"এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি জন্য কাঁচের টুকরোটাকে কারখানায় আনার প্রয়োজন হতে পারে। একটু বিবেচনা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, বিঘাউনি-রাজের নম্বর আঁটা হীরার খোপটা খালি রেখে পায়রার পায়ে সেটি বাঁধবার চেষ্টা করা বিশেষ দুঃসাহসের কাজ,—কেন না তাতে তো কিছু সময় লাগবে। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। কাজেই কারিগর স্বভাবতঃই চেষ্টা করবে এক টুকরো নকল হীরা সেই খোপে রেখে সবার চোখে ধুলো দিতে। পরদিন একটু সকাল সকাল এসে সেই কাঁচখানা উড়িয়ে দিলেই হল, কারিগরের সম্বন্ধে কর্তাদের কোন সন্দেহ হবে না, পুলিশ তাদের পেছনে লাগবে না। সুযোগ বুঝে কাঁচখানাকে পেষাইকলে চূর্ণ

করতে আধ মিনিটও সময় লাগে না—এ অতি সহজেই সমাধা হতে পারে।

"আমি গোপনে দরোয়ানের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, পরশু দিন সব্বার আগে কারখানার গেটে এসে পৌঁছেছিল ঐ খাঁকি প্যাণ্ট পরা লোকটাই; বড় বেশী গরজ কিনা, তাই দেরী সয়নি। ওর নাম যে বনমালী তাও দরোয়ানের কাছে শুনেছি।"

"এর পরের ঘটনা আর বেশি করে বলবার দরকার নেই, সংক্ষেপে বললেই চলবে। আপনাকে বিদায় দিয়ে আমি কারখানার কাছে কোন একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। তারপর ছুটির পর বনমালী বার হতেই গোপনে তার পিছু নেওয়া গেল।

"সে এসে উপস্থিত হল বাগবাজারের একটা বাড়ীর দরজায়। বার কতক কড়া নাড়তেই যে লোকটা এসে দরজা খুলে দিল তাকে দেখে আমায় দস্তুরমত চমকে যেতে হল—বছর কয়েক আগে এক জোচ্চুরির ব্যাপারে ধরতে গেলে আমিই ওকে জেলে পুরেছিলাম। লোকটার নাম অক্ষয়; জোচ্চোরের ধাড়ি। ভাবলাম জেল থেকে বেরিয়েও আবার 'হীরার ব্যবসা' ধরেছে নাকি? হালে কলকাতার মণিকার-মহলে আসল হীরার জায়গায় মাঝে মাঝে যে নকল হীরা চালান হচ্ছে সেগুলির মূলে এই মহাত্মাটি নেই তো। একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে তো। ফলে পরদিন অনেকটা সময় আমায় বাগবাজারেই কাটাতে হল।

"বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, অক্ষয়চন্দ্র আমাদের 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' কাগজের একজন নিয়মিত পাঠক। আমার মক্কেল মেসার্স ডাট এণ্ড ডাট জুয়েলার্সের সঙ্গে পরামর্শ করে সেদিন তাদেরই নামে 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বার করে দেওয়া গেল—কয়েকখানা হীরা ওঁদের ওখানে অল্প দামে বিক্রী হবে, শো-কেসে আছে—যে কোন লোক এসে দেখে যেতে পারে।

"বেশ জানতাম, ভয়ের চাইতে লোভটাই অক্ষয়চন্দ্রের বেশী। 'বঙ্গ-বিশ্লেষণ' বিজ্ঞাপন পড়বার পর সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, একটা না একটা জোচ্চুরির মতলব মাথায় নিয়ে ঠিক এসে হাজির হবে। হলও ঠিক তাই। যেমনি সে দোকানে এসে ঢোকা, আমিও অমনি কঁ্যাক করে

ওকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। বেরিয়ে এলো থান পনেরো নানান সাইজের নানান প্যাটার্নের নকল হীরা।

"এর পর আর বেশী কিছু বলবার নেই,—শুধু এটুকু ছাড়া যে আমার টেলিফোন পেয়ে অক্ষয়চন্দ্রেরই বিছানার তোষক কেটে মিঃ সেন পুলিশের সাহায্যে বিঘাউনি-রাজের হীরাখানা উদ্ধার করে এনেছেন, অক্ষয়চন্দ্র এবং বনমালী দু'জনাই এখন হাজতে।

"এই যে আমরা দমদমায় মিঃ সেনের বাড়ী এসে পড়েছি—এ পায়জি, রোখকে, রোখকে!"
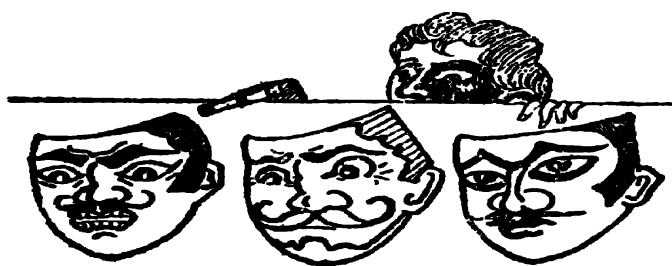
নাটক

দমাদম-দামোদর

কুশীলবগণ ঃ

দামোদর···কাঠের ব্যাপারী

ক্ষান্তমণি···দামোদরের স্ত্রী

ফ্যালারাম···ক্ষান্তমণির দাদা

কালীকৃষ্ণ বাবু···কোলাকাঠির জমিদার

দেওয়ানজী···জমীদারের প্রধান কর্ম্মচারী

উৎপল···জমীদারের পুত্র

প্যারী
হরকুমার } ···জমীদারের কর্মচারী

প্রথম দৃশ্য

দামোদর বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে।

অদূরে ক্ষান্তমণি মুখখানা হাঁড়িপানা করিয়া দাঁড়াইয়া।

দামোদর। গুড়ুক, গুড়ুক, গুড়ুক, ফোঃ! গুড়ুক, গুড়ুক, ফোঃ!

(তামাক টানা এবং ধোঁয়া ছাড়ার শব্দ)

ক্ষান্তমণি। দিনরাত হুঁকো মুখে দিয়ে তামাক টান্‌ছ, বাড়ীতে যে আর বাস করা যায় না, সেদিকে খেয়াল আছে? মাথার ওপর চা ফাঁক

হয়ে রয়েছে, ঘরের বেড়াগুলো ধ্বসে পড়ছে, দিনদুপুরে শেয়াল ঢোকে। ঘরে যতক্ষণ এক মুঠো চাল আছে ততক্ষণ কাজে তো বেরাবেই না, তার পর উপোসের পালা যখন স্বরু হ'ল তখন টাকা কমাতে যদি বা বেরোলে তো রোজগারের আদ্দেক পয়সায় কিনে আন্‌লে তামাক! দাদা এত করে বোঝান, তবু তোমার চৈতন্যি হয় না! উল্টে থামোখা তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দাও।

দামোদর। গুড়ুক, গুড়ুক, গুড়ুক, ফোঃ! গুড়্‌ক, গুড়্‌ক, ফোঃ!

(ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।)

দামোদর। তা আর দেখবে না? সাত সাত জন নেশাখোরের কুল্লে একটি বোন তুমি, জন্মে অবধি ওই জিনিষই তো কেবল দেখে আস্‌ছ। নেশাখোরের খবর তুমি রাখবে না তো রাখবে কে? গুড়্‌ক; গুড়্‌ক, গুড়্‌ক, ফোঃ! (ক্ষান্তমণির ঠিক নাকের সামনে ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল।)

ক্ষান্তমণি। (মুখ বিকৃত করিয়া নাকে কাপড় দিতে দিতে) কোথাকার পাপ রে! এর চাইতে বাপ-মা আমায় নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন?

দামোদর। নদীর জল আলকাৎরা-ময় হয়ে যেত—পাঁচখানা গাঁয়ের লোক মুখে দিতে পারত না,—সেইজন্য। স্থবিবেচনার কাজই হয়েছে বল্‌তে হবে।

ক্ষান্তমণি। উঃ, যা মুখে আসে তাই বল্‌ছে যে! এর চাইতে বাপ-মা আমায় ছেলেবেলায় নুন খাইয়ে মেরে ফেল্লে না কেন গা?

দামোদর। সেটা ভুল হয়ে গেছে সত্যিই; সে কথা তুমি নিশ্চয়ই বলতে পার।

ক্ষান্তমণি। (কান্নার সুরে) উঃ ভগবান, আঁমার কিঁ এঁকটু দঁড়িও জোঁটে না, গঁলাঁয় দেঁওয়াঁর এঁকটু দঁড়ি পাঁই না?

(ফ্যালারামের প্রবেশ)

ফ্যালারাম। কিরে ক্ষেন্তি, কিসের দড়ি পাচ্ছিস্ না? কোন্ দড়ি হারিয়েছে?

দামোদর। এই যে এসে জুটেছ মাণিক? তোমায় বাঁধবার দড়িগাছার কথা হচ্ছিল! দুঃখ করে বলছিল—নদীর ধার দিয়ে আসবার সময় দেখে এলাম, পায়ে দিব্যি কচি কচি দূর্বো গজিয়েছে! দাদাকে

যদি একটা খুঁটোয় বেঁধে দিয়ে আসতে তো কী খুসীই না হ'ত দাদা! কচি দূব্বো বলতে দাদা একেবার অজ্ঞান! কিন্তু দড়িগাছাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ক্যালারাম। বড্ড বাড় বেড়েছ যে দেখছি তুমি দামু মোড়ল! লজ্জা করে না, ঘরে এক মুঠো চাল নেই, ঘরের ছাল খসে পড়েছে—আর উনি নবাব পায়ের উপর পা রেখে তামাক টান্‌ছে! কুঁড়ের বেহদ্দ কোথাকার! তোমায় নিয়ে কলুর ঘানিতে যুড়ে দেয়, তবে তুমি সিধে হও।

দামোদর। তোমার 'সিধে'র এমন বন্দোবস্তটা করলাম তবুও মন উঠছে না, উল্টে গালি পাড়ছ?

ক্যালারাম। (সরোষে) মোড়লের ঘরের এঁড়ে, তোমার ওষুধ কি তা আমি ভাল মতই জানি—গুঁতো, কেবল গুঁতো!

দামোদর। (কৃত্রিম ভয়ের সহিত) দোহাই তোমার বাপু, গুঁতিয়ো না, গুঁতেয়ো না! দুব্বো আর ভাল না লাগে, না-ই খেলে, পাশের বাড়ীর ওঁয়ারা ভাত রেঁধে ফ্যান্ ফেলে দেয়, তাই না হয় তোমার জন্যে খানিকটা চেয়ে আন্‌ব! ফ্যান্ খেতে ইচ্ছে না হয়, ভূষি এনে দেব! তাতেও মন না উঠলে খোল খেও। খোলেও যদি রাগ না পড়ে তো—গেছেই তো ঘরের চাল, না হয় আরো খানিকটা যাবে—সেই থেকেই কিছু খড় উপড়ে দেওয়া যাবে। মোদ্দা, তুমি গুঁতিয়ো না, গুঁতিয়ো না!

ক্যালারাম। (রাগে হতজ্ঞান হইয়া) চ' ক্ষেন্তি, চ', তোকে বাড়ী নিয়ে যাব, এ হতচ্ছাড়ার কাছে আর এক দণ্ডও রাখব না।

দামোদর! (ফ্যালারামের মুখের সামনে তুড়ি মারিতে মারিতে গানের স্বরে)

শ্রীফেলুরাম শালুরে,
শ্রীফেলুরাম শালু!
এই বলেছ ভালুরে
এই বলেছ ভালু!
পোস্তা থেকে সস্তা দেখে
নিও কিছু আলুরে,
নিও কিছু আলু!

বুদ্ধি তোমার ঊর্ধ্বদিকে
উঠবে ফুঁড়ে তালুরে
উঠবে ফুঁড়ে তালু!

(কুড়াল হাতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল)

ক্ষান্তমণি। যাক্, আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, কুড়ুল নিয়ে রোজগারেই বেরিয়েছে।

ফ্যালারাম। উহুঁ, সে হবে না। আমি ঘণ্টাখানেক বাদে ঘুরে আসছি তুই এর মধ্যে তৈরী হয়ে থাকবি। হতভাগাকে দস্তুর মত শিক্ষা দিতে হবে। (ফ্যালারামের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ

ফ্যালারাম। নাঃ, দামোদরের সত্যিই বড় বাড় বেড়েছে। যখন তখন লোকের সুমুখে আমায় খামখা অপমান করাতেই যেন ওর আনন্দ! সেদিন হাটের ভেতর দশজন ভালমানুষের সামনে কি অপদস্থটাই না করলে! এর একটা বিহিত করা চাই-ই। ক্ষেন্তিকে আজ বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি, খান্ এখন বাবু কিছুদিন হাত পুড়িয়ে। কিন্তু শুধু তাইতেই আমার রাগ যাবে না। আরো একটু ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া দরকার।

(বিপরীত দিক্ হতে দেওয়ানজী, প্যারী এবং হরকুমারের প্রবেশ। দেওয়ানজী চিন্তিত ভাবে আপনার মনে পথ চলিতেছিলেন, হঠাৎ ফ্যালারামের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখী ধাক্কা লাগিয়া গেল।)

দেওয়ানজী। (অপ্রতিভ ভাবে) আহাঃ হাঃ, দেখতে পাই নি, কিছু মনে ক'র না বাছা! আমাদের মাথার উপর বড় বিপদ, তাই ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলছিলাম, দেখতে পাইনি, ধাক্কা লেগে গেছে।

ফ্যালারাম। না, না, এতে আর মনে করবার কি আছে?...কিন্তু মশাই বিপদের কথা বলছিলেন। কি বিপদ শুনতে পাই না?

দেওয়ানজী। আমরা কোলাকাঠির জমিদারের কর্মচারী। ক'দিন থেকে আমাদের খোকাবাবুর কি এক ব্যায়রাম দেখা দিয়েছে, ডাক্তার-বদ্যিরা

একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেছে। অবশ্যি খোকাবাবু আমাদের প্রাণে মারা যাবে না, তবে সহজ মানুষের মত আরাম হয়ে উঠবে এ ভরসাও কেউ দিতে পারছে না। কর্তাবাবুর হুকুমে আমরা সহরে চলেছি একজন ভাল ডাক্তারের খোঁজে। সহরের ডাক্তারই বা কি করবে বুঝে উঠতে পারছি না। দৈবের দয়া চাই।

ফ্যালারাম। (একটু চিন্তা করিয়া, স্বগত) ঠিক হয়েছে, দামু মোড়ল, এবার তোমায় সায়েস্তা করবার অস্ত্র হাতে পেয়েছি। (প্রকাশ্যে) এই ব্যাপার! তা আপনাদের কপাল ভাল যে আমার সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। আমাদের এই গাঁয়েই এক কবিরাজ আছেন, বল্লে না পেত্যয যাবেন মশাই, তিনি একেবারে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! মরা মানুষ বাঁচিয়ে দেয় মশাই—এর বেশী আর কি বলব? এমন-ধারা আমরা তো হামেশাই চোখে দেখছি!

দেওয়ানজী। (সোৎসুকে) বল কি, শুনে যে আমাদের ধড়ে আবার প্রাণ আসছে! তা' কোথায় গেলে সে মহাত্মার সাক্ষাৎ পাব বল দেখি?

ফ্যালারাম। বেশী দূরেও নয়; নদীর ধারে ঐ যে বড় জঙ্গলটা দেখতে পাচ্ছেন, ওরই ভেতর তিনি কাঠ ফাড়ছেন।

দেওয়ানজী। (সবিস্ময়ে) য়্যাঁ, কবিরাজ জঙ্গলের মধ্যে কাঠ ফাড়ছেন সে কি কথা?

প্যারী। ওষুধ খুঁজছেন বল!

ফ্যালারাম। ঐ তো মজা মশাই! দারুণ খেয়ালী লোক, মাথায় একটু ছিট আছে কিনা! হঠাৎ দেখলে কব্‌রেজ বলে আপনাদের বিশ্বাসই হ'তে চাইবে না। পরনের কাপড়-চোপড় দেখলে মনে হবে কাঠ ফাড়াই বুঝি ওঁর বাপ-দাদার ব্যবসা। কথাবার্তার ঢং শুনলে মনে হবে চোদ্দ পুরুষ ধরে ঐ কাজই বুঝি ক'রে আসছেন। এত যে গুণী লোক, অথচ লোকজনের কাছে এমনি ভাব দেখাবেন যেন কিছুই জানেন না।

দেওয়ানজী। তা হবে, বড়লোকদের প্রায়ই একটু-না-একটু ছিট থাকে বলে শোনা যায়।

ফ্যালারাম। এ লোকটির ছিট কিন্তু একটু নয়, অনেকখানি! যখন রুগী দেখবার মৎলব নেই তখন স্রেফ্ বলে বসবেন—আমি কবরেজ নই।

তবে ওঁর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হ'লে আপনাদের কি করতে হবে তাও শিখিয়ে দিচ্ছি, সেটি জানা থাকলে আর ঠক্‌বেন না। যখন দেখবেন বেজায় পাগ্‌লামি সুরু করেছে তখন আর কথাবার্তা নেই দমাদ্দম্‌ পিঠের ওপর এক ধারসে লাগাতে থাকবেন। মার খেলে তখন উনি ফের আপনাতে আপনি ফিরে আসেন। আমরা তো ওঁকে দিয়ে রুগী দেখাতে হ'লে বরাবর তাই করি—দমাদম্‌ তুলো ধুনে দি'। এইজন্য ওঁর নামই হয়ে গেছে দমাদম্‌ দামোদর কবিরাজ। দামোদর মণ্ডল নাম কিনা!

দেওয়ানজী। আচ্ছা পাগল তো!

ফ্যালারাম। হ্যাঁ; তবে কবরেজ বটে একখানা, তা স্বীকার করতেই হবে। দেবতার দয়া আছে।

দেওয়ানজী। আচ্ছা বাছা, বড়ই উপকৃত হলাম। আমরা তবে আর সহরে যাব না, ওঁরই কাছে যাচ্ছি।

(দেওয়ানজী, প্যারী, হরকুমারের প্রস্থান)

ফ্যালারাম। দামোদর ভায়া, এবার তুমি সজুত হবে। বাব্বাঃ! সঙ্গের লোক দু'টা যা যণ্ডা, ওদের হাতের গুটি কয়েক রামগাঁট্টা খেলেই তুমি ঠিক সায়েস্তা হয়ে যাবে। (প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

জঙ্গলের মধ্যে দামোদর কাঠ ফাড়িতে ফাড়িতে গান গাহিতেছিল।

দামোদর। ফাড়িব ফাড়িব কাঠ নিশ্চয় ফা-ড়িব।
ফেলুর মাথায় গাছ উপাড়ি পাড়িব।

(কিছু দূরে দেওয়ানজী, প্যারী এবং হরকুমারকে দেখা গেল।)

দেওয়ানজী। এই সেই ছদ্মবেশী মহাত্মা! চল, আমরা এগিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করি। (আগাইয়া আসিয়া) নমস্কার! দামোদর মণ্ডল কি আপনারই নাম?

দামোদর। ও বাবাঃ, এ দেখি বিনয়ের ছড়া-ছড়ি—একেবারে 'আপনি', 'আজ্ঞে'! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হাঁ।

দেওয়ানজী। মশায়ের নাম শুনেই আপনার কাছে আমাদের আসা। আমাদের মনিবের ছেলেটি মর-মর...

দামোদর। তাই পোড়াবার জন্য আগেই কাঠের বন্দোবস্ত রাখতে চান, তা কাঠ পাবেন।

দেওয়ানজী। (স্বগত) গোড়াতেই বাঁকা বুলি ধরে দেখি! (প্রকাশ্যে) মশায়ের কাজের সুখ্যাতি শুনে ··

দামোদর। তা মিথ্যে শোনেন নি; আমার মত কাঠ চ্যালাতে এ মুল্লুকে কেউ পারে না। তবে দাম কিন্তু দু' টাকা মণ দিতে হবে।

দেওয়ানজী। মশাই কি ঠাট্টা করছেন আমাদের সঙ্গে?

দামোদর। ঠাট্টা? এর চাইতে কমে আমি দিতে পারব না।

দেওয়ানজী। কী যে বাজে কথা বলেন!

দামোদর। বাজে কথার লোক আমি নই। ওর চাইতে এক আধলাও কম হবে না।

দেওয়ানজী। কেন চাতুরী করছেন আমাদের সঙ্গে।

দামোদর। (রাগত ভাবে) চাতুরী? যান না, বাজার যাচাই করে দেখুন গে!

দেওয়ানজী। কে বল্লে আপনার কাছে আমরা কাঠ কিনতে এসেছি? আপনি কে তা কি আমরা জানি না?

দামোদর। (সবিস্ময়ে) কে আমি?

দেওয়ানজী। আপনি প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দামোদর মণ্ডল।

দামোদর। ভেগে পড়ুন, ভেগে পড়ুন, মাতলামি শোনবার সময় আমার নেই।

দেওয়ানজী। (গম্ভীর গলায়) আপনি কবিরাজ ন'ন্?

দামোদর। চোদ্দ পুরুষেও নয়; হবার ইচ্ছাও নেই।

প্যারী। ইচ্ছা নেই তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ইচ্ছা করাতে হবে।

দেওয়ানজী। আর আমাদের কিন্তু কোন দোষ নেই; প্যারি, হরকুমার লেগে পড়।

(দামোদরকে ধরিয়া প্যারী এবং হরকুমারের বেদম প্রহার)

দামোদর। উঃ, উঃ, উঃ, গেলাম, গেলাম!

দেওয়ানজী। কেমন, আপনি কবিরাজ ন'ন?

দামোদর। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কবরেজ! কবরেজ বলুন কবরেজ, ডাক্তার বলুন ডাক্তার, হাকিম বলুন হাকিম, ওঝা বলুন ওঝা—সব।

দেওয়ানজী। কেন আমাকে দিয়ে শুধুশুধি অপ্রিয় কাজটা করালেন?

দামোদর। ব্যাপারটা কি বলুন দেখি? আমার সঙ্গে আপনারা ঠাট্টা আরম্ভ করেছেন কেন?

দেওয়ানজী। ফের উল্‌টো সুর? প্যারী, হরকুমার!

(দামোদরকে পুনরায় উভয়ের প্রহার)

দামোদর। হ্যাঁ, আমি কবরেজ! হ্যাঁ, আমি আমি কবরেজ! নিশ্চয়ই কবরেজ!

দেওয়ানজী। দেখুন দামোদর বাবু, আমরা আপনাকে দিয়ে মাগ্‌না কাজ করাতে চাইনে, আপনি যত খুসী টাকা চান, পাবেন।

দামোদর। (চক্ষু কপালে তুলিয়া) যত খুসী টাকা চাই পাব? (একটু মুচ্‌কি হাসিয়া) দেখুন, আমি এতক্ষণ তামাসা করছিলাম, সত্যিই আমি কবরেজ। আমার দক্ষিণা কিন্তু চৌষট্টি টাকা!

দেওয়ানজী। তার ভাবনা নেই, চলুন আমাদের সঙ্গে।

(সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জমিদারবাবুর বৈঠকখানা—তাকিয়ে ঠেস দিয়া জমিদার কালীকৃষ্ণবাবু বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। দেওয়ানজী, প্যারী এবং হরকুমারের প্রবেশ।

কালীকৃষ্ণ বাবু। (উদ্বিগ্ন ভাবে) কি দেওয়ানজী, এর মধ্যেই সহর থেকে ফিরে এলে? ডাক্তারের কি হ'ল?

দেওয়ানজী। হুজুর, ভগবান্ আমাদের উপর সুপ্রসন্ন। সহর অবধি আর যেতে হয় নি, পথে বিষ্ণুপুর গাঁয়ে এক অদ্ভুত কবিরাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। এত বড় কবিরাজ সচরাচর দেখা যায় না, যমের মুখ থেকে রুগীকে ফিরিয়ে আনে। আশ্চর্য ভগবদ্দত্ত শক্তি! তবে মাঝে মাঝে ঘাড়ে এক ভূত চাপে, এই যা দুঃখু।

কালীকৃষ্ণ বাবু। ভূত চাপে? সে কি কথা? আবার ভূতের ঝামেলা পোহাতে হবে নাকি?

দেওয়ানজী। আজ্ঞে না, সত্যি ভূতের কথা বলছি না; লোকটা ভারী খেয়ালী। হঠাৎ দেখলে কবিরাজ বলে মনেই হয় না, আবার মাঝে মাঝে বাতিক চাপলে নিজেই স্বীকার করতে চায় না যে সে কবিরাজ। তবে আপনি সে জন্য ভাবিতে হবেন না, কি ক'রে তাকে ফের

ধাতস্থ করতে হয় তা আমার বিষ্ণুপুর থেকেই সবিশেষ জেনে এসেছি।

কালীকৃষ্ণ বাবু। চিকিৎসা-পত্র বাস্তবিক ভাল করে তো?

দেওয়ানজী। আজ্ঞে ধন্বন্তরি, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

কালীকৃষ্ণ বাবু। (সোৎসুকে) তবে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন? কোথায় রেখে এলে?

দেওয়ানজী। আজ্ঞে সঙ্গে করে এনেছি বই কি! অতিথ্-শালায় চাকরেরা তাঁর পা ধুইয়ে দিচ্ছে, এক্ষুনি এসে উপস্থিত হবেন। হরকুমার, যাও তো, পা ধোয়ান হয়ে থাকলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

(হরকুমারের প্রস্থান এবং একটু পরে দামোদরকে সঙ্গে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

কালীকৃষ্ণ বাবু। আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক্। এবারে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

(বসিবার জায়গা দেখাইবার জন্য হাত বাড়াইলেন)

দামোদর। (কালীকৃষ্ণ বাবুর প্রসারিত হাতটি অমনি নিজের আঙুলের মধ্যে লইয়া, যেদিকে নাড়ী থাকে ঠিক তার বিপরীত দিকটা অনুভব করিতে করিতে) উঃ, এ যে ভয়ানক অসুখ দেখছি!

(সকলের বিস্ময়)

দেওয়ানজী। আপনার একটু ভুল হচ্ছে কব্রেজ মশাই, উনি আমাদের কর্তাবাবু। অসুখ ওঁর নয়, ওঁর ছেলের।

দামোদর। (নিজেকে সামলাইয়া লইয়া) ছেলের অসুখ, তা তার বাপের নাড়ী দেখে টের পাওয়া যাবে না? কোথাকার মূর্খের মেলায় এনে আমায় ফেল্লে গা? বলে কিনা ছেলের অসুখ নাকি তার বাপের নাড়ী দেখে ঠিক করা যায় না! এমন কথা তো কখনো শুনি নি! হাঃ হাঃ, হাঃ।

কালীকৃষ্ণ বাবু। (জনান্তিকে) দেওয়ানজী, চুপ চুপ, এ যে সে কবিরাজ নয়, আমার নাড়ী দেখেই বলে দিয়েছে—উৎপলের অসুখ ভয়ানক। ডাক্তাররাও তো ঐ একই কথা বলেছে—অসুখ ভয়ানক! তবে তাদের রুগীকে দেখতে হয়েছিল, ওঁর তাও হয়নি। দেখলে না, যেখানে আমার নাড়ী আছে সেখানে উনি হাত দেন নি, উল্টো দিকে হাত দিয়েছিলেন!

(দামোদরের প্রতি) কব্‌রেজ মশাই, আপনি কিছু মনে করবেন না, ওদের সাধারণ ডাক্তার-বদ্যিই শুধু দেখা আছে কিনা!

দামোদর। না, আমি কিছু মনে করি নি।

(বাঁ হাতটি আস্তে আস্তে বাড়াইয়া দিল।)

কালীকৃষ্ণ বাবু। (লজ্জিত ভাবে) দেওয়ানজী, কব্‌রেজ মশাইকে ফি দিলে না? ফি দাও। ডবল ফি দিও কিন্তু।

(দেওয়ানজী দামোদরের প্রসারিত হাতে টাকা দিলেন।)

কালীকৃষ্ণ বাবু। চলুন কব্‌রেজ মশাই, রুগীকে একবার একটু চোখে দেখবেন।

(কালীকৃষ্ণ বাবু, দামোদর এবং দেওয়ানজীর প্রস্থান)

হরকুমার। নাঃ, লোকটা গুণী বটে, স্বীকার করতেই হবে।

প্যারী। আর এই গুণীটিকে জোগাড় করতে আমাদের মেহনৎটাও যথেষ্টই হয়েছে সে কথাও স্বীকার করতেই হবে। (কালীকৃষ্ণ বাবুর তাকিয়াটি টানিয়া নিয়া আরামে ঠেস্ দিয়া) আঃ, শরীর জুড়ালো। কর্তার গড়গড়াটা গেল কোথায়?

হরকুমার। এই, এই প্যারী, উঠে পড়, দেওয়ানজী ফিরে আসছে, দেখে ফেলব।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ানজী। ফিয়ের টাকাটা এক্ষুনি দেরাজ থেকে বার করে রাখি, নইলে কর্তাবাবু আবার লজ্জা দেবেন।

হরকুমার। কব্‌রেজ মশাই খোকা বাবুকে দেখে কি বল্লেন?

দেওয়ানজী। বিষ্ণুপুরের সে লোকটা একটুও মিথ্যে বলে নি, বাস্তবিকই অদ্ভুত ক্ষমতা। খোকাবাবুকে একটু নেড়ে-চেড়ে বল্লেন, 'পেটের ভেতর মনে হচ্ছে ঠিক যেন বোল্‌তা বন্ বন্ করছে—নয় কি?' খোকা বাবু ঘাড় নেড়ে বল্লে, 'হুঁ'। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাথার ভেতর মনে হচ্ছে যেন ভীমরুল গুণ গুণ করছে—নয় কি?' খোকা বাবু ঘাড় নেড়ে বল্লে, 'হুঁ'। ফের শুধোলেন—'বুকের ভেতর ঠিক যেন ফড়িং ফড়্ ফড়্ করছে—কেমন, নয়?' খোকা বাবু বল্লেন, 'হুঁ'। কর্তা তো ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়েছেন।

(কালীকৃষ্ণ বাবু ও দামোদরের পুনঃ প্রবেশ)

কালীকৃষ্ণ বাবু। কেমন বুঝছেন কব্‌রেজ মশাই ?

দামোদর। ভয় নেই, আরাম করে দেব। পীলে ফাটবার জোগাড় হয়েছিল।

কালীকৃষ্ণ বাবু। (সভয়ে) বলেন কি ? আরাম হয়ে যাবে তো ?

দামোদর। আরাম হবে বৈ কি! ব্যাপারটা কি করে হয় বলি শুনুন। আমাদের পেটের ডান দিকে আছে পীলে, বাঁ দিকে আছে লিভার! দু'টোতে ভারী রেষারেষি। লিভারের মৎলব পীলে ফাটিয়ে দেবে, আর পীলের মৎলব লিভার পচিয়ে মারবে। যতক্ষণ দু'জনেরই সমান জোর, ততক্ষণ কেউ কাউকে কাবু করতে পারে না; তার ফলে মানুষের শরীর ভাল থাকে। কিন্তু যদি একটার জোর বেশী হয়ে গেল, অমনি আমাদের দেহও খারাপ হতে সুরু করল। লিভারের জোর বেশী হলেই পেটে বোল্‌তার মত বন্ বন্ ডাক উঠবে, মাথায় ভীমরুলের মত গুণ গুণ আওয়াজ হবে, বুকে ফড়িং ওড়ার মত ফর্ ফর্ শব্দ হতে থাকবে। তখনই বুঝতে হবে পীলের অবস্থা কাহিল, ফাটবার জোগাড় হয়েছে। বেশ বুঝতে পারছেন তো আমার কথা।

কালীকৃষ্ণ বাবু। সবই বুঝতে পেরেছি, শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি বললেন আমাদের পেটের ডান দিকে রয়েছে পীলে, আর বাঁ দিকে লিভার। তবে যে শুনি পীলেই থাকে বাঁ দিকে, আর লিভার থাকে ডান দিকে ?

দামোদর। (বিজ্ঞের মত হাসিয়া) আগে তাই থাকতো বটে, আজকাল উল্টে রাখা হচ্ছে।

কালীকৃষ্ণ বাবু। ভাগ্যিস্ আপনাকে পেয়েছিলাম! কব্‌রেজ মশাই, একটা মিনতি করি। আপনি একবার উৎপলের কাছে বসুন গে', কি জানি হঠাৎ যদি লিভারের জোরটা আরও একটু বেড়ে যায়! পীলেকে তবে নির্ঘাৎ ফাটিয়ে দেবে। আমি আপনার জলখাবার ওখানেই পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি। দেওয়ানজী, ফিয়ের টাকা নিয়ে এসেছ ?

দেওয়ানজী। আজ্ঞে এই যে! (দামোদরকে টাকা দিলেন।)

(সকলে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

উৎপলের রোগ-কক্ষ। খাটের উপর উৎপল শুইয়া আছে; তার কাছেই একখানা টিপয়ের উপর দামোদরের জন্য এক থালা খাবার রক্ষিত। উৎপলের দিকে পিছন ফিরিয়া দামোদর মুখ ধুইতেছে।

দামোদর। (স্বগত) আঃ, আজ ভোরে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম গা! একদিনের মধ্যেই দু'শো ছাপ্পান্ন টাকা রোজগার—ফ্যালারাম রে! যা তুই সম্বৎসরেও কামাতে পারবি নি! তার ওপর জমিদার-বাড়ীর রাজভোগ! উঃ, জলখাবারের একবার ঘটা দেখ না—চারটে ক্ষীরমোহন, ক্ষীরের নাড়ু, আরো কত কি! ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালবাসি। রুগী দেখা তো মস্ত ব্যাপার, নাড়ী টিপে যা হোক একটা বড়ি দিলেই বদ্যি হওয়া যায়। ভাগ্যিস্ লিভার নামটা শোনা ছিল! (খাবারের দিকে ফিরিয়া) ব্যাপার কি? এই দেখলাম চারটে ক্ষীরমোহন, এরই মধ্যে দু'টো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কি করে! বেড়াল-টেড়ালে নিয়ে গেল না তো! (চারিদিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে) নাঃ, কই, ও কি হ'ল, ক্ষীরের নাড়ুও দেখি আবার দু'টো উধাও হয়ে গেছে। (উৎপলের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকাইতে তাকাইতে) তুমি সরালে না তো বাবা? হ্যাঁ, ওই যে দিব্যি ঠোঁট নড়ছে এখনও। আচ্ছা দাঁড়াও, এর শোধ দিচ্ছি ভাল করেই। ঝাড়া পনেরোটি দিন জল-বার্লি খাইয়ে রাখব। (উৎপলের দিকে আগাইয়া, প্রকাশ্যে) এখন কেমন আছ বাবা?

উৎপল। খুব ভাল। কালকে আমার আরাম হবার দিন।

দামোদর। কি বাবা, এখন যে পনেরো দিনের মধ্যে তোমায় পাশ ফিরতেও দিতে পারব না।

উৎপল। কেন? বড্ড বেশী টাকার গন্ধ পেয়েছ বুঝি?

দামোদর। এসব কি বকছ? ভুল বকতে সুরু করলে নাকি?

উৎপল। ভুল নয়, ঠিকই বলছি। বলছি এই কথা যে, কাঠ বেচে এক বচ্ছরে যা পাও, একদিনেই তো তা পুষিয়ে নিয়েছ। এখন বুঝি পনেরো বচ্ছরেরটা গুছিয়ে না নিতে পারলে মন উঠছে না? বেটা কাঠুরে, ভেবেছ আমি তোমায় চিন্‌তে পারি নি? সহরের বাজারে মাঝে মাঝে

কাঠ বেচতে তোমায় দেখি নি? আমাদের হোস্টেলে গেল মাসে ছ'গাড়ী কাট বেচে আসো নি? কী কব্‌রেজ মশাই, মুখ দিয়ে 'রা' বেরুচ্ছে না কেন?

দামোদর। (স্বগত) এই সেরেছে! (প্রকাশ্যে) খোকা বাবু, ক্ষীরমোহন খাবে?

উৎপল। সে তো খাবই, তবে সে জন্যে তোমার অনুমতি চাই না। দেখ, তোমায় চুপি চুপি বলছি অসুখ-বিসুখ সব আমার ভড়ং। পরীক্ষার পড়া তৈরী হয় নি, তাই তা থেকে রেহাই পাবার জন্যে অসুখের ছুতো ধরে হোস্টেল থেকে চলে এসেছি। আজ আমাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, কাজেই কাল আমায় আরাম হতেই হবে। তুমি কাল বাবার সামনে নাড়ী টিপে বলবে, আমার আর একরত্তিও অসুখ নেই, তোমার চিকিৎসায় সব উবে গেছে। আর যে সব গোপন কথা তোমায় বল্লাম তা যদি ফাঁস করে দাও, তবে কি হবে তা তো বুঝতেই পারছ। বাবা এমনি সোজা লোক, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তুমি মিথ্যে বুজরুকি করেছ জানতে পারলে পিঠের চামড়া নিয়ে আর এ বাড়ী থেকে বেরুতে পারবে না?

দামোদর। (কাতর ভাবে) খোকা বাবু, আর দু'টো দিন সবুর করতে পারবে না?

উৎপল। কেন, অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে বুঝি? তা দেখ, তুমি গরীব লোক, দু'পয়সা পাও তা'তে আমার আপত্তি নেই। আমার পরামর্শ যদি শোন তবে দু'দিকই বজায় থাকবে। নেবু দিয়ে এক গ্লাস মিশ্রির সরবৎ তৈরী ক'রে রেখ, বাবা আমায় দেখতে এলে ব'ল—তুমি যে অসুখ ঠাউরেছ বাস্তবিকই সেটা হয়ে থাকলে এই ওষুধেই কাল আমি একদম আরাম হয়ে যাব। তারপর সরবৎটা আমায় খাইয়ে দিও। কাল আমি চাঙ্গা হয়ে উঠে বসব। তোমার কব্‌রেজীর কেরামতী দেখে বাবা নিশ্চয়ই তা হ'লে তোমায় অনেক টাকা বক্‌শিস্ দিয়ে দেবেন—আমি তাঁর স্বভাব জানি কিনা!

দামোদর। আচ্ছা খোকাবাবু, তাই হবে 'খন।

উৎপল। বেশ। এইবার লক্ষ্মীছেলের মত ভাল ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এস দেখি। ক'দিন জল-সাবু খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছে,

একটু ক্ষীরমোহন দিয়ে মুখের তারটা ফিরিয়ে আনি। তোমার ভাগটা একটু কমে গেল, কিছু মনে ক'র না। আর দেখ, তোমার ও-বেলার জল-খাবারটাও যেন এ ঘরেই দিয়ে যায়—বিশেষ ক'রে ব'লে দিও।

(দামোদর ম্লানমুখে উঠিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কালীকৃষ্ণ বাবুর বৈঠকখানা

কালীকৃষ্ণ বাবু। কব্‌রেজ মশাই, আপনার দয়ার কথা জীবনে ভুলব না। আর আপনি যে অদ্ভুত চিকিৎসায় আমার ছেলেকে একদিনে ভাল করে দিলেন সবার কাছে এইটেই আজ থেকে আমার গল্প করবার বিষয় হবে। যদি কিছু মনে না করেন, তবে এই সামান্য পারিতোষিকটা···

(পকেট হইতে পাচশো টাকার নোট বাহির করিলেন।)

দামোদর। ওর আর কি দরকার ছিল? (কালীকৃষ্ণ বাবুর হাত হইতে নোট প্রায় ছিনাইয়া লইয়া) আজকাল রুগী আমি বড় একটা দেখি না। (প্যারী এবং হরকুমারের দিকে চাহিয়া) দোহাই বাবা, আমি কব্‌রেজ, আমি কব্‌রেজ!

দেওয়ানজী। নিশ্চয়ই। কবরেজের শিরোমণি।

দামোদর। (স্বগত) ফ্যালারাম রে, আমি এখন বাড়ী ফিরছি না। সটান শ্বশুরবাড়ী গিয়ে নোট ক'খানি তোমার নাকের সামনে নাচিয়ে নেব।

যবনিকা

গল্প

ঢেঁকিবাহনের কলঙ্কভঞ্জন

মহারাজ রাবণের লঙ্কাস্থ বাড়ীতে কিছু সমারোহের আয়োজন হইয়াছে। সামনেই রাণী মন্দোদরীর 'তাড়কা-ব্রত' উদ্‌যাপনের দিন। মানুষীদের মত রাক্ষসীদেরও ব্রত আছে—আর তার মধ্যে 'তাড়কা-ব্রত'ই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ। রাণীর সাধ গিয়াছে, এই ব্যাপারে একটু ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা হয়। এ কথার অর্থ এই নয় যে ব্রত উদ্‌যাপনের দিন মন্দোদরী কয়েকটি ব্রাহ্মণ ধরিয়া ভোজন করিবেন। সে-দিন রাক্ষসদের আর নাই। এখন তারা দুনিয়ার একটি সভ্য জাত। দেশের সৎ ব্রাহ্মণদের ও-দিন পেট পুরিয়া খাওয়ানোই রাণীর আন্তরিক অভিলাষ।

সভ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাবণ রাজা ইদানীং বড়ই কৃপণ হইয়া পড়িয়াছেন, গাঁটের পয়সা বড় সহজে বাহির করিতে চান না। তাঁহার সাবেক আমলের তৈরী লঙ্কাস্থ বাড়ীটা ছিল আগাগোড়া সোনায় মোড়া, লোকে তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিত 'স্বর্ণপুরী লঙ্কা'। রাজা এখন তার সমস্ত সোনা তুলিয়া নিয়া ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিয়াছেন,—লোকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুলিলে বলেন, "ও-সব আর্কিটেক্‌চার পুরোনো হয়ে গেছে। লণ্ডন নিউইয়র্কে নতুন

ধরণের আর্কিটেক্চার দেখে এসেছি, এবার তারই বন্দোবস্ত করতে হবে।" আসলে কিন্তু রাশি রাশি সোনাই কেবল লঙ্কা-ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছে, নূতন আর্কিটেক্চারের কোন পাত্তাই নাই।

সেবার যখন কুমার মেঘনাদ কোটি কোটি দর্শকের সম্মুখে মহারাজ ইন্দ্রকে টেনিস খেলায় পরাজিত করিয়া 'ইন্দ্রজিৎ' উপাধি লাভ করেন তখন রাবণকে একটা বড়দরের ভোজের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মস্ত বড় একটা গলদ সেখানে রহিয়া গিয়াছিল। ত্রিভুবনের সমস্ত জাতিরই বাছা বাছা লোকের সে-ভোজে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, কেবল বাদ পড়িয়াছিল দৈত্যেরা। দৈত্যেরা আজও সম্পূর্ণ সভ্য হইয়া উঠে নাই, কাজেই বোধ করি তাদের কথা তখন কারোও খেয়ালে আসে নাই। কথাটা লইয়া ক্রমে কিন্তু দৈত্য-মহলে বেশ আলোচনা সুরু হইল। রাবণ বুঝিলেন বাস্তবিকই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে—দৈত্যেরা ইহাকে মর্মান্তিক অপমান বলিয়া মনে করিতে পারে, হয়ত চিরকালের জন্য তাদের সঙ্গে রাক্ষসদের একটা অসদ্ভাবের সৃষ্টি হইবে—একটা যুদ্ধবিগ্রহ বাধাও বিচিত্র নয়। তিনি ঠিক করিলেন শীঘ্রই ব্যাপারটাকে শোধরাইয়া লইবেন—দৈত্যদের বড় বড় কয়েকটি চাঁইকে একদিন নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়া দিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। কিছু টাকা খরচ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু রাবণ রাজা কাঁচা ছেলে নন, এত বড় একটা রাজ্য চালাইয়া আসিয়াছেন তো। শীঘ্রই যে রাণী মন্দোদরীর 'তাড়কা-ব্রত' উদ্‌যাপনের দিন তা তাঁর ডায়েরীতে লেখা ছিল, তিনি স্থির করিলেন একই খরচে দুই কাজ সারিয়া ফেলিবেন—দৈত্যদের ভোজ আর ব্রতের নিমন্ত্রণ। বলা বাহুল্য, ইহাতে রাণী খুসীই হইবেন, কেন না তিনি ময়-দানবের মেয়ে, সেই সুবাদে দৈত্যেরা তাঁর বাপের বাড়ীর দেশের লোক। ব্রতের দিন ঘনাইয়া আসিতেই তাই বৃত্রাসুর, মহিষাসুর, তারকাসুর, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি বড় বড় দৈত্যদের নামে নিমন্ত্রণ-পত্র লেখা হইল, প্রত্যেকটি দৈত্যের নিকট আলাদা আলাদা দূত পাঠান হইবে, ঠিক হইল—মহারাজ রাবণ স্বহস্তে প্রত্যেকখানি চিঠি সই করিয়া দিলেন।

. . .

নিমন্ত্রণপত্র হস্তে রাবণের দূত যখন বৃত্রাসুরের প্রাসাদে আসিয়া পৌছিল তখন বৃত্র তাঁহার নিতান্ত প্রিয় এবং বিশ্বস্ত কর্মচারী মৎস্যাসুরকে লইয়া বৈষয়িক কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। কিছুদিন যাবৎ কয়েক বিঘা জমি লইয়া

বৃত্রাসুরের সহিত মহিষাসুরের বড়ই গোলমাল চলিতেছে। এই জমি সম্বন্ধে মহিষাসুর কাল বৃত্রকে একখানা পত্র দিয়াছেন, আজ তাই মৎস্যাসুরের সঙ্গে নিরিবিলিতে পরামর্শ করিয়া বৃত্র তাহার জবাব দিতে বসিয়াছেন।

বৃত্র বলিতেছেন, "আচ্ছা, এবার তবে কাগজ কলমে চিঠিখানা লিখে ফেল! লেখ—প্রত্যেক বিঘায় দশ মণ ধান হয়···"

মৎস্যাসুর কথা কয়টি কাগজে লিখিয়া কহিল, "হুঁ, লিখেছি; তারপর ?"

বৃত্র বলিলেন, "কি লিখলে একবার পড় দেখি ?"

মৎস্যাসুর পড়িল, "প্রত্যেক বিগায় দশ মণ···"

"বিগা নয়, বিঘা।"

মৎস্যাসুর লেখা শুদ্ধ করিয়া পুনরায় পড়িল, "প্রত্যেক বিঘায় দশ মণ দান অয়।"

"উঁহু, দান নয়, ধান; আর অয় নয়, হয়। শুদ্ধ করে লেখ।"

মৎস্যাসুর মাছ খাইতে খুব ভালবাসিত, জীবনের অধিকাংশ সময় তাই গোয়ালন্দে কাটাইয়াছে; কাজেই সেখানকার উচ্চারণ তার ধাতস্থ হইয়া গিয়াছিল। ধান বলিতে সে এখনও মাঝে মাঝে দান উচ্চারণ করে, ভাত বলিতে বাত বলিয়া ফেলে। লজ্জিত ভাবে সে তাহার লেখা দ্বিতীয়বার সংশোধন করিতে যাইবে এমন সময় বৃত্রের খাস কেরাণী আসিয়া কহিল, "লঙ্কা থেকে রাবণ রাজার দূত একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

বৃত্রাসুর ভ্রূ কুঁচকাইয়া ক্ষণকাল কি একটু ভাবিলেন, তারপর কহিলেন, "বেশ, দূতকে এখানে নিয়ে এস।"

দূত আসিয়া অভিবাদন করিতেই বৃত্র কহিলেন, "কি সংবাদ আছে তোমার চিঠিতে ? পড়।"

রাবণের দূত তখন তাঁহার সেই নিমন্ত্রণ পত্রখানা পড়িয়া শুনাইল।

বৃত্রের গোঁফের পাশ দিয়া একটা হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার মিলাইয়া গেল। তিনি কেরাণীকে হুকুম দিলেন, "একে বাইরের ঘরে নিয়ে বসাও।" দূতকে কহিলেন, "আমি এ চিঠির একটা জবাব দেব; সেটা নিয়ে তবে তুমি যেও।"

রাক্ষস-দূত চোখের আড়ালে গেলে মৎস্যাসুর বলিল, "রাবণের দেখি বড়

সুমতি এবার! সেবারকার ভোজে তো দৈত্যদের একদম বাদই দিয়েছিল!"

বৃত্রাসুর বলিলেন, "হুঁ, আগে রাবণ রাজার চিঠিখানাই লিখে ফেলা যাক্, তারপর আমাদের অন্য কাজগুলো সারা যাবে।"

মৎস্যাসুর প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী চিঠি লেখার কাগজ এবং কলম লইয়া প্রস্তুত হইতেই বৃত্র রাবণকে যাহা লিখিতে হইবে বলিয়া গেলেন। লেখা শেষ হইলে ব্লটিং পেপারে কালিটা শুষিয়া নিয়া চিঠিখানা মৎস্যাসুর বৃত্রের হাতে বাড়াইয়া দিল, উদ্দেশ্য, যদি কোন কথা সংশোধন করিবার থাকে বৃত্র নিজেই তাহা করিবেন। বৃত্র সেখানার উপর সামান্য একটু কলম বুলাইয়া শেষে নীচে নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন। মৎস্যাসুর তখন উঠিয়া গিয়া অপর একটা ঘর হইতে থাম, গালা, বৃত্রের নামাঙ্কিত মোহর প্রভৃতি লইয়া আসিল— বৃত্র চিঠিখানার উপর আর একবার চোখ বুলাইয়া সেখানা শীলমোহর করিতে দিলেন। তারপর খাস কেরাণীর তলব পড়িল। বৃত্র তাহাকে মৌখিক গুটি কয়েক উপদেশ দিয়া চিঠিখানা রাবণ রাজার দূতকে দিবার হুকুম দিলেন। কেরাণী চলিয়া গেলে মৎস্যাসুরের সঙ্গে আবার তাঁহার গোপনীয় বৈষয়িক কাজকর্ম আরম্ভ হইল।

দেখিতে দেখিতে ব্রত উদ্‌যাপনের আগের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দোদরীর আজ আর বিশ্রাম নাই, ভোজে কি কি পদ রান্না হইবে তারই ফর্দ প্রস্তুত করিতে তিনি গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিলেন। রাবণের বিরাট গোষ্ঠী—ভাই, ভাইপো, ভাগ্নে, ভাগ্নী, ছেলেপিলেতে বাড়ী সরগরম। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা তার নিজের মনোমত কয়েকটি পদ ভোজে রান্না হয়, তাই সকলে মিলিয়া মন্দোদরীকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। কেউ বলিতেছে, "আঃ জ্যাঠাইমা, সেবার লব-কুশের পৈতের সময় অযোধ্যায় ওরা যে ছ্যানার পোলাওটা খাইয়েছিল, তার স্বোয়াদ যেন এখনো মুখে লেগে রয়েছে!"

অপর একজন একটু আমিষের পক্ষপাতী—সে কহিল, "ঘটোৎকচের বি-এ পাশের ভোজে হিড়িম্বা দেবী যে হাঙরের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল রেঁধেছিলেন, মনে আছে মামীমা, আপনি নাকি দু'বার চেয়ে খেয়েছিলেন। আমার মনে হয়, দৈত্যেরা ওটা খুব এ্যাপ্রিসিয়েট করবে।"

দলের মধ্যে যারা নিতান্ত অতি-আধুনিক তারা মত প্রকাশ করিল,

"ক্যালকাটার ক্যান্টন রেষ্টুরেন্টের 'ফ্যাংচাউটা' এবার লঙ্কা নগরে চলন না করলে আর মান থাকে না, লোকচক্ষে নিতান্ত সেকেলে বনতে হয়।"

মন্দোদরী খাবারের তালিকা হস্তে যখন অত্যন্ত ব্যস্ত, অদূরে তখন দেখা গেল রাবণের মা নিকষা একখানা পঞ্জিকা হাতে এদিকে আসিতেছেন। উপস্থিত সকলে প্রমাদ গণিল, কেন না নিকষা বুড়ীর বড়ই কুসংস্কার—পঞ্জিকার মতে আজ 'বার্ত্তাকু-ভক্ষণ নিষেধ', কাল 'অমুক-ভোজন নিষেধ' প্রভৃতি বহু নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া তিনি নাকি ইতিপূর্বে অনেক ভাল ভাল 'ফিস্ট' মাটি করিয়া দিয়াছেন। শাশুড়ীকে এদিকে আসিতে দেখিয়া মন্দোদরী একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই নিকষা কহিলেন, "পাঁজিটা দেখেছ বৌমা? কাল বাছা কুম্ভুর জাগবার দিন। একটু বাঘ ভাজার বন্দোবস্ত ক'র, বাছা আমার বাঘ-ভাজা বলতে একেবারে অজ্ঞান।"

'বাছা কুম্ভু' কুম্ভকর্ণের মায়ের দেওয়া আদরের নাম। লঙ্কাপুরীর এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু কুম্ভকর্ণ আমাদের পূর্বেও যা ছিলেন এখনও প্রায় তাই-ই আছেন। যতক্ষণ জাগিয়া থাকেন, টেলিফোনে কেবল চীনের ল্যাং-প্যাং-ব্যাংএর সহিত আফিং-এর দর কষাকষি করেন, আর প্রচুর পরিমাণে আফিং-এর অর্ডার দেন। ইহাতে রাবণ বড়ই খাপ্পা, লোকের কাছে বলিয়া বেড়ান, "ভায়ার আর কি, টেলিফোনের বিল তো আর ট্যাঁক থেকে দিতে হয় না, দাদার ঘাড় রয়েছে, ভাঙলেই হ'ল!" তার পর আফিং আসিয়া পৌছিলে তাহা সেবন এবং দিনের পর দিন অকাতরে নিদ্রা। যেদিন জাগেন, সেদিন একটু 'ইম্‌প্রুভড্ ডায়েটের' বন্দোবস্ত না করিলে তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তোলেন।

শাশুড়ীর কথায় মন্দোদরী একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, "বাঘ-ভাজা—"

"হ্যাঁ বৌমা, বাঘ ভাজা। বেসন-গোলার বাটিতে এপিঠ-ওপিঠ ডুবিয়ে নিয়ে গরম ঘিয়ের কড়ায় ছাড়তে হবে। বেশ মচমচে হলে নামিয়ে নেবে। মৌরী-ভাজা কিম্বা পাঁচফোড়ন গোলার ভেতর দিলেও হয়—না দিলেও ক্ষতি নেই।"

মন্দোদরী তখন চিন্তিত মুখে রাবণের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন, কেন-না ভাল টাটকা বাঘ পাইতে হইলে এখনই সুন্দরবনে বায়না দেওয়া দরকার।

একতলায় মহারাজের কাছাকাছি আসিতেই কিন্তু রাণী থমকিয়া

দাঁড়াইলেন—কামরার ভিতর হইতে অতি তীব্র ক্রুদ্ধকণ্ঠের চীৎকার শব্দ আসিতেছে। জানালায় উঁকি মারিয়া মন্দোদরী যাহা দেখিলেন তাহাতে কৌতূহল তাঁহার কমিল তো না-ই, বরং চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

তিনি দেখিলেন—বৃত্রাসুরকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য যে রাক্ষসটিকে দূত পাঠান হইয়াছিল সে বেচারা বিবর্ণ মুখে সামনে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে, আর মহারাজ রাবণ অগ্নিমূর্তিতে চেয়ারে বসিয়া গজরাইতেছেন, তাঁর হাতে একটি খোলা চিঠি। রাণী আরও দেখিলেন, অদূরে একটি পাঁঠা, আর সেটার গলায় বড় বড় কাঁচা হাতের অক্ষরে লেখা—'রাবণ রাজা'।

ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মন্দোদরী ধীরে ধীরে সেই ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণ একেবারে কামানের গোলার মত ফাটিয়া পড়িলেন, "দেখ রাণী, তোমার বাপের বাড়ীর দেশের লোকগুলোর ভদ্রতা-জ্ঞান! নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছিলাম, তার জবাবে জানোয়ার বৃত্রাসুর কি অপমানজনক চিঠি লিখে পাঠিয়েছে!"

মন্দোদরী চিঠিখানা পড়িবার জন্য হাতে লইলেন। দেখিলেন তাতে লেখা আছে—"শুনিয়াছি আপনি আস্ত পাঁঠা। খাইতে নাকি বড়ই সুস্বাদু। মনে করেন, আমি আপনার যম। জবাই ছাড়া আর কিছুই না —দৈত্যদের সঙ্গে রাক্ষসদের উহা ছাড়া আর কোনই সম্পর্ক থাকিতে পারে না। আমরা মনে করি, আপনি ক্ষুদ্র জীবটি। অল্প আঁচে পোড়াইয়া খাইলে আমার নিজের বড়ই তৃপ্তি হইবে এবং আমার অধীনস্থ দৈত্যগণও বিশেষ পুলকিত হইবে।"

চিঠি পড়িয়া রাণী হতভম্বের মত গালে হাত দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর কহিলেন, "মেঘনাদের ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ানশিপের ভোজে বৃত্রকে নেমন্তন্ন করা হয় নি সে অপমান দেখছি আজও সে ভুলতে পারে নি—রেগে টং হয়ে আছে।"

"টং হওয়া বার করছি। এক্ষুনি এ চিঠি আমি রাক্ষস-পার্লামেণ্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারা নিশ্চয়ই তাঁদের রাজার এ অপমান বরদাস্ত করবে না। তারপর জেনারেল ধূম্রাক্ষ ও তাঁর সৈন্যদের কামান যখন ধূম্র-উদ্গীরণ করে বৃত্রপুরী ছারখার করে দেবে, আশা করা যায় বৃত্রাসুরের গরম মাথা তখন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।" বলিয়া রাবণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাবণ যথার্থ অনুমান করিয়াছিলেন ; রাজাকে এরূপ নিতান্ত অপমানকর চিঠি লেখায় রাক্ষসদল একেবারে ক্ষেপিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ রাক্ষস-সভা স্থির করিল বৃত্রকে তার অপরাধের উচিত শাস্তি দিতেই হইবে। দেখিতে দেখিতে জেনারেল ধূম্রাক্ষের অধীনে রাক্ষস-সৈন্যগণের মধ্যে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল—অসংখ্য সাঁজোয়া গাড়ী বড় বড় কামান লইয়া প্রস্তুত হইল। তার পর মার্চ করিয়া বৃত্রপুরীর দিকে রওনা হইবার পূর্বে রাজাকে একবার কুচকাওয়াজ দেখাইবার জন্য সকলে রাজবাড়ীর সম্মুখে খোলা মাঠে আসিয়া সমবেত হইল।

রাবণ প্রাসাদের বাহিরে আসিলেন। সৈন্যদের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইতেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার মাথার উপর—খুব নীচু দিয়া একখানা ছোটমত এরোপ্লেন উড়িয়া চলিয়াছে; দেখিতে সেখানা অনেকটা ঢেঁকির মত। তাঁহার কেমন সন্দেহ হইল, তাড়াতাড়ি ধূম্রাক্ষের 'ফিল্ড গ্লাসটা' চোখে লাগাইয়া নিবিষ্টমনে তিনি সেটাকে দেখিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সৈন্যদলকে ইশারা করিলেন; রাজার ইঙ্গিত পাইয়া সৈন্যেরা অমনি এরোপ্লেনখানাকে নামিবার জন্য সঙ্কেত করিতে লাগিল। একটু পরেই বোঝা গেল বিমানচালক সঙ্কেত টের পাইয়াছে, কেন না এরোপ্লেনখানা নামিবার জন্য চক্রাকারে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার পর মাটি ছুঁইতেই ভিতর হইতে নামিয়া আসিলেন দেবর্ষি নারদ।

নারদ কহিলেন, "বৎস রাবণ, আমি দেব-সভায় বীণা বাজাতে যাচ্ছিলাম, মাঝপথে তুমি আমায় নামতে সঙ্কেত করলে কেন?"

রাবণ দেবর্ষির পাদবন্দনা করিয়া কহিলেন, "প্রভু, ক্ষমা করবেন। দু'টো কারণে আপনাকে নামাতে হয়েছে। প্রথম কারণ, আমার সৈন্যেরা যুদ্ধযাত্রা করছে—আপনি পূজ্য ব্যক্তি, তাই আপনার আশীর্বাদলাভের লোভ সামলাতে পারি নি, আপনি আশীর্বাদ করুন আমার সৈন্যেরা যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসে। আর দ্বিতীয় কথা, আপনি যাবার সময় দয়া করে একটু ঘুরে যমরাজকে খবর দিয়ে যাবেন তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন, শীগ্‌গিরই বৃত্রাসুরকে আমরা তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি।"

নারদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি হে, আজ সকালেই যে খবরের কাগজে পড়লাম বউমার ব্রত, তুমি তাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছ!"

"হ্যাঁ প্রভু, ঠিক খবরই পড়েছেন। কিন্তু সে হতভাগা বর্বরটা আমার

নেমন্তন্ন-পত্রের কি জবাব দিয়েছে দেখবেন?” বৃত্রের চিঠিখানা রাবণের পকেটেই ছিল, নারদকে সেখানা তিনি পড়িতে দিলেন।

নারদ চিঠিখানা পড়িলেন—একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলেন। ক্রমশঃই তাঁহার ভ্রূ অধিকতর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন, “এখানে হবে না বাছা, তোমার বৈঠকখানায় চল। আর একটা পেন্সিল আর ইরেজার আমায় আনিয়ে দাও তো!”

নারদকে বসিবার ঘরে আনিয়া পেন্সিল ও ইরেজার দেওয়া হইল। তিনি কাগজখানার উপর কি যেন একটু আঁচড়ে কাটিলেন, কি একটু ঘষাঘষি করিলেন, তার পর বলিলেন, “আচ্ছা রাবণ, এবার চিঠিখানা পড় তো!” রাবণ উচ্চকণ্ঠে পড়িতে লাগিলেন—“শুনিয়াছি আপনি আস্ত পাঁঠা খাইতে নাকি বড়ই সুস্বাদু মনে করেন। আমি আপনার যমজ বাই (ভাই) ছাড়া আর কিছুই না—দৈত্যদের সঙ্গে রাক্ষসদের উহা ছাড়া আর কোনই সম্পর্ক থাকিতে পারে না, আমরা মনে করি। আপনি ক্ষুদ্র জীবটি অল্প আঁচে পোড়াইয়া খাইলে আমার নিজের বড়ই তৃপ্তি হইবে এবং আমার অধীনস্থ দৈত্যগণও বিশেষ পুলকিত হইবে। ইতি বৃত্রাসুর।”

চিঠিখানা পড়িয়া রাবণ রাজা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া নারদ ঋষির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নারদ হো হো শব্দে উচ্চে হাসিয়া কহিলেন, “এর সঙ্গে একটা পাঁঠাও নিশ্চয়ই এসেছে। দেখ দেখি কাণ্ড, তুমি আস্ত পাঁঠার রোস্ট খেতে ভালবাস জেনে সে তোমায় তাই একটা উপহার পাঠিয়েছে, আর তুমি চাইছ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার গর্দান নিতে! আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে জান? বৃত্র এক আহাম্মুককে দিয়ে চিঠিখানা লিখিয়েছে; সে বেচারা যেমন তার মনিবের কথাগুলো শুনেছে, বড় বড় ফাঁক ফাঁক গোটা গোটা হরফে তাই লিখে গেছে—দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন কিছুই দেওয়া আবশ্যক বোধ করে নি—অর্থাৎ বুদ্ধিতে কুলোয় নি। অসভ্য দৈত্য জাত তো, চিঠিখানা লিখতে পেরেছে এই যথেষ্ট! চিঠি শেষ করে ব্লটিং পেপারে চাপ দিয়ে বৃত্রকে সে সেটা সই করতে দিয়েছে। বৃত্র আবার আর এক পণ্ডিত। তার জানা আছে লেখার মধ্যে কতগুলি দাঁড়ি, কমা থাকে, —কাজেই বিদ্যে ফলাবার জন্যে যেখানে-সেখানে কতকগুলি দাঁড়ি, কমা, ড্যাশ বসিয়ে চিঠিতে সই করেছে। ফলে চিঠির সমস্ত অর্থ গেছে উল্টে। ইরেজার দিয়ে আমি বৃত্রের বসানো দাঁড়ি কমাগুলো তুলে পেন্সিলে জায়গা-মত

সেইগুলো বসিয়েছি, অমনি চিঠির আসল অর্থ ফুটে বেরিয়েছে। তুমি চিঠিখানা আমার হাতে দিতেই আমি দেখলাম সমস্ত অক্ষরগুলো একটু ফিকে ফিকে কালিতে লেখা, অথচ দাঁড়ি, কমা এবং বৃত্রাসুরের নিজের নাম-সইটা ওরই ভেতর একটু আপেক্ষাকৃত গাঢ় কালিতে দেওয়া। তখনই বুঝলাম কেউ একজন চিঠি লিখে ব্লট করে বৃত্রের হাতে দিয়েছিল, বৃত্র দাঁড়ি কমা প্রভৃতি চিহ্ন বসিয়ে নাম সই করেছে। বৃত্রের লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কাগজখানার ওপর দ্বিতীয়বার আর ব্লটিংএর চাপ পড়ে নি, কাজেই কতকটা লেখা ফিকে আর কতকটা একটু গাঢ়ভাবে দেখা যাচ্ছে।" কথাগুলি বলিতে বলিতে নারদের দৃষ্টি গিয়া পড়িল ঘরের কোণে বাঁধা একটি নধর পাঁঠার উপর। তিনি আবার হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওই বুঝি সেই পাঁঠাটা! দেখেছ মূর্খের কাণ্ড! পাঁঠাটা তোমার, তাই তার গলায় তোমার নামের লেবেল এঁটে দিয়েছে। এর যে আর একটা মানে হতে পারে—লোকে যে মনে করতে পারে তোমাকেই পাঁঠা বলে গাল দেওয়া ওদের উদ্দেশ্য—মূর্খগুলোর মাথায় তা ঢোকেই নি। শাস্ত্রে কি সাধে বলে মূর্খ ইষ্ট করতে গেলেও অনিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়?"

তখন সেখানে যে একটা হাসির ঢেউ উঠিল তা আর কি বলিব! কিন্তু হাসির পাট শেষ না হইতেই সকলে দেখে, একখানা বড় এরোপ্লেন (ইন্দ্রের নিকট হইতে ধার করা?) রাজবাড়ীর সম্মুখে নামিতেছে এবং একটু পরে আরও দেখা গেল স্বয়ং বৃত্রাসুর কয়েকটি সহচরের সহিত নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য লঙ্কায় পদার্পণ করিতেছেন। রাবণ সদলবলে গিয়া তাঁকে অভ্যর্থনা করিলেন। দুয়েকটি শিষ্টাচারের পর বৃত্র বলিলেন, "এত সৈন্যসামন্ত কিসের মহারাজ? এ যে প্রায় যুদ্ধযাত্রার আয়োজন!"

রাবণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "হেঁ হেঁ, আপনাদের মত গণ্যমান্য অতিথি আজ আমার গরীবখানায় আসছেন —হেঁ হেঁ, একটু সম্মান দেখাতে হবে না?"

"তা এত কামান কেন? এ দিয়ে যে একটা দেশ জয় করা যায়।"

"আপনাদের সম্মানের জন্য কিছু তোপধ্বনি করতে হবে না?" রাবণ ধূম্রাক্ষের দিকে তাকাইয়া একটু চোখের ইশারা করিলেন, অমনি একশ'টি কামান গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বৃত্রকে একশ'টি 'স্যালিউট্' জানাইয়া দিল।

এইবার নারদ রাবণকে একটু আড়ালে ডাকিয়া নিয়া কহিলেন, "বৎস,

এবার তবে আমি বিদায় হই, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দেখ, বাংলা দেশের লোকেদের ধারণা আমি শুধু ঝগড়া বাধাতেই পটু, আমি যে ঝগড়া মেটাতেও পারি সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না।" বলিয়া তিনি একটু ম্লান হাসি হাসিলেন।

রাবণ বলিলেন, "প্রভু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কথা দিচ্ছি আজকের এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ যাতে বাংলা দেশে প্রচারিত হয় তার ব্যবস্থা আমি করবই করব।"

"তাই কর তবে।" বলিয়া নারদ তাঁর ঢেঁকি-প্লেনে গিয়ে উঠিলেন।

পাল্টা জবাব

যে ব্যাপারটা লইয়া সেবার তারকের সহিত নিমাইয়ের ঝগড়া বাধিয়া গেল সেটা কিন্তু নিতান্ত সামান্যই বলিতে হইবে। নিমাই এমনি যে খারাপ তা নয়, কিন্তু অপরকে কথায় কথায় ঠাট্টা করা ছিল তার একটা প্রকাণ্ড দোষ। কোন প্রকারে কাহারও একটু ত্রুটি পাইলেই হইল, অমনি শ্রীমান্ নিমাইচন্দ্র তাহার দফাটি ঠাণ্ডা করিয়া তবে নিজে ঠাণ্ডা হইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া সে যে তারকেরও পিছনে লাগিতে সাহস করিবে সেটা কিন্তু আমরাও মনে করি নাই। তারক,—ও বাবাঃ ক্লাসের ফার্স্ট বয় সে, সারা স্কুল—এমন কি মাষ্টার-মহলে পর্যন্ত তাহার নামডাক—তাকে লইয়া কিনা রং-তামাসা! ভাবিতেও যে আমাদের কেমন করে!

ব্যাপারটা যা ঘটিল তা সংক্ষেপে এই: তারকের বাড়ী ছিল যশোর জেলায়। এমনি কথাবার্তায় তাহার বড় একটা দেশী টান দেখিতাম না, কিন্তু রাগিয়া গেলেই তাহার কথার ধরণটা কেমন যেন একটু বদলাইয়া যাইত। তারকের ছোট ভাই ভুবন আমাদের স্কুলেই নীচের ক্লাসে পড়িত, স্কুলেও আসা-যাওয়া করিত তারকের সঙ্গেই। তা না হইলে, ছেলেমানুষ, একলা যাতায়াত করিবে কি করিয়া? চারিটা পর্যন্ত স্কুলে থাকিতে হইলে মানুষের তো এমনই ক্ষুধা পায়, আর ক্ষুধা পাইলে কার না রাগ হয় বল? তারকের রোজই এই রকম ক্ষুধা পাইত, আর রাগ হইত; কাজেই স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার

সময়ে সে হাঁটিত বিষম জোরে। কিন্তু ভুবন তো হাজার হোক্ ছেলেমানুষ, সে কেন পারিবে তাহার দাদার সহিত অত জোরে হাঁটিতে? কাজেই ভুবন পড়িয়া থাকিত ক্রমাগত পিছনে, আর তারক রাগে গজ্-গজ্ করিতে করিতে বলিত, "তড়াতড়ি আট্, নইলি পরে আচ্ছা করি পিট্টানি দিবানি।"

ব্যাপারটা জানিতাম সকলেই, কিন্তু ইহা লইয়া কেউ কোন দিন উচ্চবাচ্য করি নাই। নিমাই কিন্তু সেদিন সংস্কৃত ক্লাসে ফস্ করিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। পড়া ছিল বালী-সুগ্রীব-কথা। রিডিং পড়িয়া মানে করিতে করিতে নিমাই বলিয়া ফেলিল, "ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বালী সুগ্রীবকে আচ্ছা করি পিট্টানি দিলানি।" আমরা তো শুনিয়া একেবারে থ'! চাহিয়া দেখি, তারকের মুখচোখ লাল হইয়া গিয়াছে। মনে মনে বুঝিলাম, তারক ব্যাপারটাকে সহজে ছাড়িবে না। বার বারই সারিয়া যাও, এবার শক্ত ঘানিতে পড়িয়াছ নিমাইচন্দ্র!

কথাটা ঠিকই ধরিয়াছিলাম। বিকালে তারকদের বাড়ী গিয়া দেখি, সেখানে দস্তরমত সভা বসিয়া গিয়াছে। কী, এত স্পর্ধা! নিমাই পাইয়াছে কি? যখন তখন, যাহাকে তাহাকে অপদস্থ করিয়া বসিবে! সাপের পাঁচ-পা দেখিয়াছে নাকি? রাগটা খালি তারকের একার নয়, অনেকেই নাকাল হইয়াছে কিনা! গোবিন্দ বলিল, "আমার কথাটাই ধর্ না কেন! সবে নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছি, ছোঁড়া এসে আমাকে জিজ্ঞেসা করলে, 'হ্যাঁ হে, তুমি কি পড়?' বেশ নরম-সরম ভাবে জবাব দিলাম, 'পুস্তক পড়ি।' তাই শুনে একেবারে বত্রিশ পাটী দাঁত বের করে বল্লে, 'ও হোঃ হোঃ, তাই নাকি, আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি বস্ত্র পর।'—আ-হা-হা, কি একটা হাসির কথাই না বল্লেন ছেলে! বস্ত্র মানে কাপড়, তা কি আর কেউ জানে? তবু যদি ফি পরীক্ষাতে তারকের চাইতে নীচে না হতেন!"

হরিদাস বলিল, "আরে, তুই তো তুই, ওর গুরু-লঘু-জ্ঞানটাই বা কোন্ আছে? সে দিন বাজারের পথে ড্রইং-মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা। নমস্কার করতেই হেসে বল্লেন, 'তোমরা তো এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলে, কে কোন বিষয়ে অ্যাডিশন্যাল নেবে?' আমরা কেউ বল্লাম 'ম্যাথেমেটিক্‌স স্যান্‌স্ক্রিট', আর ও ছোকরা কিনা বলে বস্‌লে, 'স্যর, আমি

নেব ড্রইং আর ড্রিল্!' ড্রইং মাষ্টার ঠাণ্ডা মানুষ, তাই কিছু বল্লেন না, হেড্ মাষ্টার হ'লে কানটাকে টেনে আধ হাত লম্বা করে দিতেন।"

এই রকমের অত্যাচার আর মানুষে মুখ বুজিয়া সহ্য করে কি করিয়া? তাই ঠিক হইল নিমাইকে বেশ একটু ভাল ভাবেই জব্দ করিতে হইবে। কিন্তু, কি ভাবে জব্দ করা যায়, সেই তো হইল কথা। গোবিন্দ বলিল, "একটা কাজ করা যাক। একটা খড়ের লেজ তৈরি ক'রে, সেটাকে নিয়ে আমাদের একজন ওর শোবার ঘরে খাটের নীচে লুকিয়ে থাক। তারপর ও যেই ঘুমিয়ে পড়বে, অমনি সেটাকে ওর কোমরের সাথে জড়িয়ে বেঁধে দিলেই দিব্যি মজা হবে। পরদিন যখন ইস্কুলে যাবে তখন ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত লেজ দেখে হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়বে; যেমন ও হনুমান, তেমনি তার উপযুক্ত সাজাটা হবে।"

তারক বলিল, "আরে দূর, তা কি হয়! ও ভোরে উঠে নিজেই তো সব টের পেয়ে যাবে। আর যদিই বা তা না টের পায়, ওর বাড়ীর লোকেরাই তো ধরে ফেলবে! ও কি তাই নিয়ে স্কুলে যাবে ভেবেছিস্?" গোবিন্দ বলিল, "ও হোঃ, তাও তো বটে!" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, ও ঘুমিয়ে পড়লে ক্ষুর দিয়ে ওর মাথাটা কামিয়ে দিলে হয় না? নেড়া মাথা নিয়ে স্কুলে যেতে নিশ্চয় খুব লজ্জা পাবে?"

এবার জবাব দিল চিন্তাহরণ। বিরক্ত হইয়া বলিল, "আরে, থুইয়া দে, খামাখা প্যাচাল পাড়স্ ক্যান? মাথা কামানের কালে ও ট্যার পাইবো না? আমি কই, তারক, অরে ধইরা একদিন পিট্টি ভাগনের কাম!"

তারক বলিল, "না না না, সে সব নয়; ওর মত চালাক দুনিয়ার আর নেই। ওকে একদিন সব্বার সামনে বোকা বানাতে হবে। আজ তোদের কারুর মাথাতেই ভাল ফন্দী-টন্দী আসছে না দেখছি—আজ থাক্, রাত্রিটা ভেবে-চিন্তে দেখি, কাল যা হয় করা যাবে।"

সে রাতটা ভাবিয়া-চিন্তিয়া তারক এক তোফা ফন্দী বাহির করিয়া ফেলিল। মৎলবটা হইল এই: আমাদের স্কুলের ছাত্রদের একটা সভা ছিল; মাষ্টার মশাইদের সঙ্গে সে সভার কোন সম্পর্কই ছিল না—ছাত্ররাই ছিল তার সর্বেসর্বা। মাসের মধ্যে একবার করিয়া সেই সভা বসিত, আর আমরা সেখানে প্রবন্ধ পড়িতাম, বাংলায় বক্তৃতা দিতাম, তর্ক করিতাম, কত কি

করিতাম! ঠিক হইল, নিমাইকে এই সভায় একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে বলা হইবে। থিয়েটার-রেসিটেশনে ছোকরার ভারী সখ, কাজেই রাজী না হইয়া আর যাইবে কোথায়? অপর ছেলেদের কিন্তু এদিকে জানাইয়া রাখা হইবে যে নিমাই সেদিন ইংরাজীতে একটা বক্তৃতা দিবে। তারপর বাছাধন যেমনি গুটি গুটি কবিতা রেসিটেশন করিতে উঠিবেন, অমনি আমরা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিব, কই তোমার না কথা ছিল আজ ইংরাজীতে বক্তৃতা দিবার? বেচারা ভ্যাবাচাকা খাইয়া যাইবে। তখন আমাদের আর কিছুই করিবার দরকার হইবে না, সেই দেড়শো-দু'শো ছেলেই ক্ষেপাইয়া, টিটকারি দিয়া, উঠিতে বসিতে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া মারিবে। কেমন খাসা মৎলবখানা বল দেখি! আরে, তারক না হইলে কি এ সব হয়? অমনি অমনি কি আর ও ফি বার অঙ্কে পূরা নম্বর পায়? কেমন তুখোড় বুদ্ধি দেখ দেখি!

আমরা যেমনটি হইবে ভাবিয়াছিলাম, হইলও অবিকল তেমনটি।

নির্দিষ্ট দিনে, নিমাই কবিতা বলিতে উঠিবার ঠিক আগে, তারক উঠিয়া বলিল, "এবার সভায় শ্রীনিমাইচরণ বসু 'পুস্তক পাঠের উপকারিতা' সম্বন্ধে ইংরেজীতে বক্তৃতা করবে।" অমনি নিমাই বলিয়া উঠিল, "সে কি, বক্তৃতা দেবার কথা আবার কখন হ'ল? সে রকম তো কোন কথা ছিল না!"

আমরা সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, "বাঃ রে বাঃ, ছিল বৈ কি? গাঁজা খেয়ে এসেছিস্ নাকি?"

অতটুকু ছেলে, ইংরাজীতে কেমন করিয়া বক্তৃতা দেয় তাই শুনিতেই না ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া আসিয়াছিল! বক্তৃতা হইবে না শুনিয়া তাহারা গেল একদম্ ক্ষেপিয়া। কেউ সুরু করিল কুকুরের ডাক, কেউ শুরু করিল বিড়ালের ডাক, কেউ বা শুধু হাততালি দিয়াই নিমাইকে টিট্‌কারির চোটে অস্থির করিয়া তুলিল। আমাদের তখন যা ফুর্তি! গোবিন্দ তো এক রকম নাচিতেই আরম্ভ করিয়া দিল।

ওদিকে চাহিয়া দেখি, নিমাইয়ের মুখ অপমানে, রাগে একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "বেশ, তাই হবে, আমি ইংরেজীতেই বক্তৃতা দেব। তোমরা সব চুপ কর—"

এক মুহূর্তের মধ্যে অমনি সব চুপ্‌চাপ্—এমন চুপ্‌চাপ্ যে মনে

হইল ছুঁচটী পড়িলেও বুঝি বা তোলার শব্দটা কানে আসিবে। নিমাই বক্তৃতা আরম্ভ করিল। কিন্তু সবে তো সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়াছে, সে কেন পারিবে অত বড় একটা কঠিন বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে? মিনিট খানেক এঁ্যা এঁ্যা করিয়া শেষে সে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

তখন ঘরে একেবারে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। সেই যে পুরাণে আছে—মহাদেবের ভূতেরাও (পণ্ডিত মশায় আমাদের সকলকেই 'ভূত' বলেন; বোধহয় ভূত মানেই স্কুলের ছাত্র!) তেমনি টেবিল-চেয়ার উল্‌টাইয়া একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড করিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিমাইয়ের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছিল,—ছুঃখে নয়, রাগে। তার বয়স এই চৌদ্দ বছর। এই বয়সেও এতখানি অপমান এ পর্যন্ত কেউ তাকে করে নাই, বিশেষতঃ নীচের ক্লাসের ছেলেদের সামনে। চোখ দু'টাকে আগুনের মত লাল করিয়া, আমাদের দিকে একবার তাকাইয়া সে বলিল, "তোরা সব ভীরু, তোরা সব কাপুরুষ! ভেবেছিস্ আমাকে খুব একচোট জব্দ ক'রে নিলি। আরে গাধারা, একে জব্দ করা বলে না, আড়াল থেকে ঢিল মারা। 'জব্দ করা' ক'াকে বলে সে আর কয়েক দিন বাদেই টের পাবি। বেশী দিনও নয়, আজ তো ২৯শে মার্চ এই পয়লা এপ্রিলেই বুঝবি। বলে-কয়ে, সেদিন তোদের এপ্রিল-ফুল্ করবো!" কথা কয়টা বলিয়াই নিমাই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। আমরা সকলে তখন খুব একচোট হাসিয়া লইলাম। তারক বলিল, "দেখলি, ছোঁড়া ভাঙ্গবে, তবু মচকাবে না। তোরা কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি রে! দেখি, ও যে খুব জ াকিয়ে দেমাক্ করে চলে গেল—দেখি, ও পয়লা এপ্রিল কি করতে পারে আমাদের!"

পয়লা এপ্রিলের আগের দিন! ভোর বেলা নিমাই আসিয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত। কি ব্যাপার, না কাল তাহারা ২৬।১ সেন পাড়ায় 'অবাক্ জলপান' অভিনয় করিবে, তাহারই নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। ছোকরা চলিয়া গেলে মনে মনে হাসিলাম। নিমাইচন্দ্র ভাব বুঝি যে দুনিয়ায় একা তুমিই চালাক? কাল যে এপ্রিল-ফুল করার মৎলব—সেটা যেন আর ধরিতে পারি নাই!—হুন দিয়া তো আর আমরা ভাত খাই না।

বিকালের দিক্ দিয়া নিমাই আবার আসিয়া উপস্থিত। আমাকে চুপি

চুপি ডাকিয়া বলিল, "দেখ, তোর সঙ্গে চালাকি করাটা আর ভাল মনে করলাম না। থিয়েটার-টিয়েটার কিন্তু আসলে সবই ফাঁকি! তারকদের ওপর আমার বেজায় রাগ—ওদের সব ক'টাকেই তাই কাল এপ্রিল-ফুল করবো ঠিক করেছি। যে ঠিকানাটা দিয়েছি সেটা হ'ল একটা আস্তাবলের। তুই বুদ্ধিমান ছেলে, সব ধরে ফেলবি, তাই তোকে সব খুলে বল্লাম। দেখিস্, ওদের যেন কিছু বলিস্-টলিস্ নে। কাল গোটা চারেকের সময় হাঁটতে হাঁটতে একবার ওদিক পানে যাস্—দেখিস্ সব গরুগুলোকে কি রকম বোকা বানাই।"

আমি বলিলাম, "এপ্রিল-ফুল যে করবি তা আমি আগেই টের পেয়েছি।"

"তা আর পাবি নে? অঙ্কে ত্রিশ পাস-মার্ক, তুই ফি বার একত্রিশ পাচ্ছিস, আর এই সামান্য কথাটা বুঝবি নে? ওরা কিন্তু তাই বলে কিছুই টের পাবে না। দেখ, ঐ তারকাটা এগ্‌জামিনে ফার্স্ট হয় বটে, কিন্তু ওটার মাথার ভেতর কি আছে জানিস?"

নিমাইয়ের কথাবার্তায় আমি ক্রমেই ভারী খুসী হইয়া উঠিতেছিলাম, তাই তাকেও একটু খুসী করা উচিত মনে করিয়া বলিলাম, "গোবর।"

সে বলিল, "উঁহুঁ, গোবরও কাজে লাগে, শুকালে ঘুঁটে হয়। ওর মাথায় আছে খালি পচা গোবর, যা কোনই কাজে লাগে না। আর বাদ-বাকী যেগুলো, সেগুলোর মাথায় কিছু নেই, একেবারে ফাঁপা—চাঁটি মারলে ঠুং ঠুং করে বাজে। তোরই মাথায় যা একটু সোনারূপো আছে; থাব্‌ড়া মারলে মোটেই ওরকম শব্দ হবে না। দেখবি?"—বলিয়া আমার মাথায় এমন জোরে দুই চড় মারিল যে মনে হইল মাথাটা বুঝি একেবারে চুরমার হইয়া গেল। ভয়ানক রাগ হইল, কিন্তু তবুও নিমাই আমার অনেক প্রশংসা করিয়াছে, তাকে কড়া কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না—মনে কষ্ট পাইবে যে।

যাইবার সময় নিমাই বলিয়া গেল, "এ সব কথা কাউকে বলিস নে যেন, খবর্দার!"

বলিলাম, "আরে, না না, সে ভয় নেই।" মনে করিলাম, আমি তো আর বোকা বনিব না, অপরে কেমন বোকা বনে একবার দেখিয়াই আসি না কেন?

পরদিন বেলা চারিটার সময় হাঁটিতে হাঁটিতে নিমাইয়ের সেই ২৬।১ সেন পাড়ার আস্তাবলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, তারকের দল সেখানে আগেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারী আশ্চর্য হইলাম। কি বোকা রে, নিমাই যে এপ্রিল ফুল করিবার মৎলব করিয়াছে, এই নিতান্ত মোটা কথাটাও বুঝিতে পারিল না? কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য হইলাম ছোঁড়াগুলির ব্যবহারে। দশ-বারোটি ছেলে—মুখে কাহারও কথাটি নাই—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে—তারক শুদ্ধ। আ ম'লো যা, ছোঁড়াগুলো হাসে কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রে, তোরা হাসছিস কেন রে, সিদ্ধিটিদ্ধি খেয়েছিস নাকি?"

এতক্ষণ চলিতেছিল মুচ্‌কি হাসি, আমার কথায় এইবার সকলে স্থুরু করিয়া দিল একেবারে অট্টহাসি। ওঃ, সে কি হাসির তোড়, বুঝি বা ভূমিকম্পই হয়! মনে বড় ভয় হইল, তাই তো, নিমাই কি শেষে সব কয়টাকে সিদ্ধির সরবৎ খাওয়াইয়া দিল নাকি? আমাদের একটা চাকর দোলের দিন সিদ্ধি খাইয়া খুব একচোট হাসিয়াছিল। তারপর ছুটিয়া গিয়া, আমাদের গরুর চারিটা ঠ্যাং-এর মাঝখানে, ঠিক পেটের তলায় চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। ভাবিলাম তাই তো, এই দশ-বারোটা ছেলে যদি আমাকেই গরু মনে করিয়া ছুটিয়া আমার দুই ঠ্যাং-এর মধ্যে বসিতে আসে, তাহা হইলেই তো কাজ সারিয়াছে! ভয়ে ভয়ে একটু পিছাইয়া আসিলাম; কিন্তু ভগবানের মস্ত দয়া, তাহারা আমাকে গরু মনে করিল না। কিন্তু তার বদলে যে আর একটা কাজ করিল তাহাতে আমার তো একেবারে চক্ষুস্থির। বলিলামই তো যে প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল মুচকি হাসি, তারপর হইল অট্টহাসি; এইবার আরম্ভ হইল একেবারে আবোল-তাবোল বকা! কিন্তু আশ্চর্য, প্রত্যেকের মুখেই এক কথা—প্রত্যেকেই বলে, "আরে, আমি তো আগেই জানতাম!" কি জানিত তাহা তো কেউ বলে না! হঠাৎ তারক একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "কি রে, তোরা কি জানতিস রে?"

তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পর যে ব্যাপারটা প্রকাশ পাইল তাহাতে আমরা সকলে একেবারে মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। কি সর্বনাশ, হতচ্ছাড়া নিমাই আমাদের সব্বাইকে কি দারুণ বোকাই না বানাইয়াছে! কি হইয়াছে বুঝিতে পারিলে? হতভাগা আমার মত

প্রত্যেকের কাছে গিয়াই বলিয়াছে, "দেখ্, তোর সঙ্গে কি আর আমি চালাকি করতে পারি, তুই এমন বুদ্ধিমান্। আর সকলকে আমি এপ্রিল-ফুল করবো, তুই শুধু একবার দাঁড়িয়ে মজাটা দেখ্।" প্রত্যেকেই মনে করিয়াছে, ওঃ, আমি কি জেতাটাই না জিতিলাম! আর সেই ভাবিয়া আসিয়াছে অপরকে ঠাট্টা করিতে। ফলে, প্রত্যেকেই হইয়াছে জব্দের চূড়ান্ত। শুধু কি তাই? তারক ভিন্ন আর সকলকেই ও বলিয়াছে, "তোরই মাথায় যা একটু সোনারূপো আছে, বাদ-বাকীগুলোর মত ফাঁপা নয়; থাবড়া মারলে মোটেই বাজে না,—দেখবি?" বলিয়াই গায়ে যত জোর আছে তত জোরে চড় মারিয়াছে। গোবিন্দকে নাকি এমনি জোরে মারিয়াছিল যে বেচারা একেবারে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। কি ধুরন্ধর ছেলে বাবা, মনের সুখে আমাদের সকলকে তো চড়াইয়া লইলই, আর তার উপর নাকালও করিল যতদূর করিতে হয় ততদূর।

সব শেষে তারক বলিল, "তবু বরাত ভাল যে ছোঁড়া এখানে উপস্থিত নেই; থাকলে আর আমাদের মুখ দেখাবার যো থাকতো না।"

ঠিক এমন সময় একটা হাসির শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া দেখি যে আমাদের মাথার উপরে, একটা গাছের ডালে বসিয়া নিমাই এমনই হাসিতেছে যে বোধ হইল যেন এখনি সে গাছ হইতে পড়িয়া যাইবে। হায় রে হায়, সব তো দেখিয়া ফেলিয়াছে! আর কি সেখানে থাকা যায়? আমরা চট্‌পট সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

সেই হইতে নিমাইকে প্রতিশোধ দিবার ফিকির খুঁজিতেছি, কিন্তু ছোকরা বেজায় চালাক। আচ্ছা, তোদের কি মনে হয়, প্রতিশোধ নিতে পারবি না?
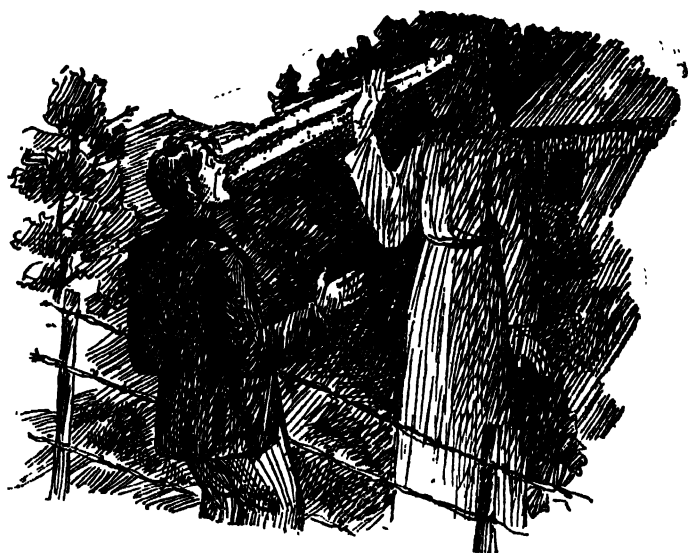
ভুতুড়ে পাহাড়

বর্ষাকালে কবি দ্বিজু রায়ের নাকি সব চাইতে ভাল লাগিত—"মুড়ি দিয়ে ফুলুরি খেতে কুপ্ কাপ্!" পুরা কবি না হইলেও বিবাহের প্রীতি-উপহার-টুপহার দু'পাঁচটা লিখিয়াছি তো, তাই সেদিন বর্ষায় আমরাও ফুলুরি খাইতেছিলাম, তবে মুড়ি দিয়া নয়, চা দিয়া।

'ভোজ'টি চলিতেছিল দার্জিলিংয়ের লুই জুবিলি স্যানিটেরিয়ামে বসিয়া। নানা রকমের 'গল্প' হইতে হইতে শেষটায় একেবারে সেরা গপ্পে আসিয়া পৌঁছিল—ভূতের গপ্পে। আমরা সবাই কলিকাতায় থাকি, পূজার ছুটিতে দিন কয়েকের জন্য হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছি মাত্র। কিন্তু কানাইবাবু দার্জিলিং-এর বরাবরকার বাসিন্দা; তিনিই আসর জমকাইয়া তুলিলেন প্রশ্ন করিয়া—"মশাইরা ভূত মানেন ?"

দেখিলাম সবাই মানে, শুধু এই পরম পাপী আমি ছাড়া। শুধু মানা নয়, সকলেই নাকি এক-একবার করিয়া ভূতের খপ্পরে পর্যন্ত পড়িয়াছিল, বহু কষ্টে পার পাইয়াছে। অবিনাশ তো নাকি সাবাড়ই হইয়া যাইত,

যদি না তাদের উড়ে বামুনের টিকিটা চাপিয়া ধরিতে পাইত। তবু ভূত তাকে শাসাইয়া রাখিয়াছে—"বাঁগে পাবঁরে এঁকদিন পাবোঁ!"

ঘাড় বাঁকাইয়া একটু হাসিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অবিনাশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে রাগিয়া বলিল, "কিষ্কিন্ধ্যার মর্কট তুমি, হাসবেই তো বাবা! তবে এও বলে রাখছি যে, প্রভুরা যদি বাস্তবিকই কৃপা একবার করেন তো তোমার সুগ্রীব-অঙ্গদের ঠাকুর্দা এলেও ঠেকাতে পারবে না!"

অবিনাশের স্বভাবই এই। কথার প্রতিবাদ করলেই রাগিয়া যায়, আর রাগিয়া গেলেই আমাকে "কিষ্কিন্ধ্যার মর্কট" বলিয়া গাল পাড়ে। তার কারণ, বাল্যকালটা আমার কাটিয়াছিল বরাবরই মাদ্রাজে এবং পণ্ডিতেরা নাকি অনেক গবেষণা করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে, পৌরাণিক আমলের কিষ্কিন্ধ্যা সহরটি ছিল আজকালকার মাদ্রাজ সহরের কাছাকাছি কোন একটা জায়গায়। অতএব......"

অবিনাশের কথার আমি কোনই প্রত্যুত্তর করিলাম না। কেন না তাহাতে কোনই লাভ নাই, উপরন্তু আরও কিছু গালি খাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কথাগুলি যে তার আমি নিতান্তই তাচ্ছিল্যের সহিত লইতেছি, কানাইবাবু সেটা বুঝিলেন। আমার মুখের দিকে একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বোধ করি ওসব দুর্বলতা আদৌ নেই বিজয়বাবু, ভূত-টুত বোধ করি কুসংস্কার বলেই মনে করেন?"

"আপনি ঠিক ধরেছেন কানাই বাবু, ও বিষয়ে অবিনাশ ভায়ার মত ঠিক অতখানি উঁচুতে এখনও উঠতে পারি নি।"

"আচ্ছা সন্ধ্যের পর একা একা একবার রোংরু পাহাড়টা ঘুরে আসতে পারেন।"

"পারি, যদি সে পাহাড়টার নাম করলেন সেটা অতিমাত্রায় দুর্গম না হয়, আর সেখানে যাবার পথটা বাৎলে দেন।"

কানাই বাবু কহিলেন, "না না, দুর্গম তেমন কিছু নয়—সহর থেকে মাইল চারেকের ভেতরেই জায়গাটা। তবে লোকজনের চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাস্তাঘাট জংলা হয়ে গেছে সে কথা সত্যি। শীতকালে, শোনা যায়, কথনো ভালুক-টালুকও দু'-একটা বার হয়, তবে এ দিনে সে ভয় কিছুমাত্র নেই। দূর গাঁয়ের পাহাড়ীরা ক্বচিৎ কথনো কথনো ও-পথ দিয়ে সহরে এসে থাকে

বটে, তবে সে দিনমানে। সন্ধ্যার পর রোংক্ল পাহাড়ে পা দিতে পারে এমন সাহসী পুরুষ এ তল্লাটে একটীও খুঁজে পাবেন না।"

"কেন?"

"ওখানে একটি সাহেব ভূত আছে।"

সাহেব মরিয়া ভূত হইলেই তাকে 'সাহেব ভূত' বলা হয় এ কথা জানিতাম। আরও জানিতাম, লোকের ধারণা অপর ভূতের চাইতে সাহেব ভূতেরা ঢের বেশী হিংস্র—মানুষের দেখা পাইলে তার রক্ত পান করা তাদের চাই-ই চাই। তাই সমস্ত ব্যাপারটা জানিবার জন্য ভারী কৌতূহল হইল। কানাই বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা সহর থেকে অতদূরে অমন নিরালা পাহাড়ে গিয়ে ভূত তার আড্ডা গাড়লে কেন?"

কানাই বাবু বলিলেন, "সে এক ইতিহাস মশাই! বোধ করি আট-দশ বছর আগেকার কথা, এক খ্রীস্টান পাদ্রী সাহেব গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অল্প কিছু জায়গা ইজারা নিয়ে নিজের থাকবার জন্যে রোংক্ল পাহাড়ে ছোট্ট একটা কুঠি বানাল। সাহেবের মৎলবটা বোধ করি ছিল ওখানে একটা স্থায়ীমত আড্ডা গেড়ে আশপাশের গাঁ-গুলোতে ধর্ম-প্রচার করে বেড়াবে। সহরের বাইরে একটু নিরিবিলিও হবে, আবার যখন খুসী ঘোড়ায় চড়ে সহরে এসে পৌছাতে কোন বেগও পেতে হবে না। তার অভিপ্রায় কিন্তু পূর্ণ হতে পেলে না। কুঠি তৈরীর সঙ্গে সঙ্গেই একদিন বাগানের হাতায় তাকে সাপে কাটলে, সাহেবকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হ'ল। অপঘাতে মরার দরুণ ভূত হয়ে সে তার কুঠি আগলে বসে আছে, তার দাপটে রোংক্ল পাহাড়ের ত্রিসীমায়ও কারো ঘেঁষবার জো নেই। কতবার কত পাহাড়ীর কাছে সেই বীভৎস প্রেতাত্মার কথা শোনা গেছে—অমন ভয়ানক মূর্তি নাকি কল্পনাতেই আনা যায় না! মুখ-হাতগুলো পোড়া অঙ্গারের মত কালো হয়ে গেছে; সেই কালো মুখে ইয়া বড় বড় আগুনের গোলার মত টকটকে লাল হু'টো চোখ। ক্রমাগত সে দু'টো ঘুরছে। মিশনারী সাহেবদের মত আলখাল্লা গোছের একটা পোষাক পরে কুঠির আশপাশে প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়, মানুষ দেখলেই বিকট হুঙ্কার করে ধেয়ে আসে।"

কানাই বাবু বর্ণনা শেষ করিয়া থামিলেন; সকলেই স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। আমি কহিলাম, "ভূতের তো মশাই, অধ্যবসায় আছে খুব!

এই দশ বছর ধরে সমানে সে কুঠি আগলে বসে আছে, অত্যাচার তার একটুও কমে নি।"

কানাই বাবু বলিলেন, "ছাই কমেছে। বরং কিছুকাল হ'ল নতুন উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন শুধু সাহেব ভূতের বেড়িয়ে বেড়ানর কথাই শুনে আসছিলাম, কিন্তু কিছুদিন থেকে শুনছি রাত একটু গভীর হলেই নাকি আজকাল প্রকাণ্ড একটা আলোর ভাঁটাকে কুঠির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। মস্ত ভাঁটাটি, চারদিক থেকে নাকি তার তীব্র সবুজ আলো ঠিকরে বার হয়! কথাটাকে গোড়াতে যে গাঁজাখুঁরি বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা না হয়েছিল তা মনে করবেন না, বার্চ হিলের ওপর থেকে নীচে রোংরু পাহাড়ের কুঠিটা দিব্যি চোখে পড়ে। কাল রাত্রে আমরা ক' বন্ধুতে স্পষ্ট সেই ভূতুড়ে আলোর ভাঁটাটা কুঠির চারপাশে ঘুরতে দেখেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সহরের এত কাছে ব্যাপারটা ঘটছে আর পুলিশ একবার তদ্বির করাটাও আবশ্যক বোধ করছে না?"

জিভ্ এবং তালুর সাহায্যে একটা শব্দ উচ্চারণ করিয়া কানাই বাবু বলিলেন, "আরে মশাই পুলিশ! স্বয়ং ডেপুটি কমিশনারের কানে কথাটা তোলা হয়েছিল, তা তিনি তো হেসেই অস্থির। বললেন, 'খুব বীরপুরুষ তোমরা, বোঝা গেছে। এখন যার যার নিজের নিজের বাড়ী যাও। আলোর ভাঁটা যখন তোমাদের বাড়ী গিয়ে পৌছুবে তখন ফের এসে খবর ক'র।"

অবিনাশ রাগিয়া বলিল, "হুঁ, দরদ তো উপচে পড়বেই, সাহেব ভূত কিনা।"

সে রাতে আমাকে গিয়া অবিনাশকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে হইল। ভূত যে তাহাকে শাসাইয়া রাখিয়াছে—যদি বাগে সত্যিই পায়?

পরদিন ভোর হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়া সুরু হইয়াছিল, ঠিক করিলাম যে সকালটায় আর বেড়াইতে বাহির হইব না। কেন জানি না, বরাবর দেখিয়াছি বাদলার দিনে আমার ছোটবেলাকার কথা মনে পড়িয়া যায়। শৈশবে মাদ্রাজী সহপাঠীদের সঙ্গে কি সুখেই না দিনগুলি কাটিয়াছে! বড় হইয়া সে সব বন্ধুরা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে কে জানে! দিন কয়েক আগে মাদ্রাজের এক বন্ধুর কাছ হইতে একখানা গ্রুপ্ ফটো উপহার পাইয়াছিলাম, স্যুটকেস্ খুলিয়া সেখানা বাহির করিয়া আনিলাম। অশেষাদ্রি

চালু, লক্ষ্মণস্বামী আয়েঙ্গার, ভেঙ্কট রাঘবম্ সকলেই সে ছবিতে আছে। কিন্তু তবুও যেন তৃপ্তি হইল না—এ তাঁদের বড় হইয়া তোলা ফটো, ছোট বেলার সেই কচি মুখগুলি এর মধ্যে নাই। কেবল ভেঙ্কট রাঘবনের চেহারাটায় আগের মত ছেলেমি ভাবই রহিয়া গিয়াছে। দেখিতে ছোট হইলেও সেই ছিল আমাদের মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিমান্। বড় হইয়া সে নাকি কোথায় প্রোফেসারি চাকরী লইয়াছে—অনেক বইও নাকি লিখিয়াছে!

মশ্‌গুল হইয়া পুরানো দিনের কথাগুলি ভাবিতেছি, এমন সময় কে যেন ঠক্ ঠক্ করিয়া দুয়ারে আসিয়া ঘা মারিল। উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দেখি পদম্ বাহাদুর একেবারে মিলিটারী চালে ঘরে ঢুকিতেছে। লোকটা এখানেই কোন সরকারী আপিসে চাকরী করে—ভারী শিকারের সখ। কবে নাকি তাকে কথা দিয়াছি তার সঙ্গে শিকারে যাইব, আজ রবিবার দেখিয়া সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তার এ আগমন।

বাদলার দোহাই, আলস্যের ওজর—কিছুতেই যখন সেই নাছোড়বান্দা লোকটীর হাত হইতে পার পাওয়া গেল না, অগত্যা তখন বলিলাম, বেশী দূর বাপু, যাইতে পারিব না, মেহনৎও বেশী করিতে পারিব না। সাদা কথায়, পাখী শিকারে যদি তার আপত্তি না থাকে তবে বেলা সাড়ে তিনটায় হাতিয়ার সংগ্রহ করিয়া সে যেন আসে—দেখা যাইবে।

বহুকাল পরে আবার ঘোড়ার উপর। ছোট বেলায় ঘোড়া চালাইতে খুবই মজবুৎ ছিলাম, বিনা জিনেও কত চালাইয়াছি কিন্তু এতদিন কলিকাতায় থাকার ফলে ভুঁড়িটা বেশ একটু নেয়াপাতি গোছের হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঘোড়ার পিঠে নাচিতে আর রাজী হয় না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। ওদিকে সহরের সীমানার ধারে আসিয়াই পদম্ বাহাদুরের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবার মাসতুতো ভায়ের মত এমনই ছুট দিল যে আমার সাধ্যেই কুলাইল না তার সাথে সমানে তাল রাখি। ঠিক সেই মুহূর্তে, সময় বুঝিয়াই বোধ করি, জোরে এক পশলা বৃষ্টি আসিয়া সামনের দিকটা এমনই ঝাপ্‌সা করিয়া দিল যে কিছুই আর নজরে আসে না। বাঁ দিকে প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়, ডানদিকে পাঁচশো ফুট নীচু খাদ, তার মাঝখানটা দিয়া ঘোড়া হাঁকাইবার রাস্তা। বৃষ্টিতে এবং কুয়াশায় সামনে দৃষ্টি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। গোপনে সত্যি কথাটা চুপি চুপি স্বীকার করিয়াই ফেলি—আমার মশায়, সে

অবস্থায় ঘোড়া চালাইতে আর সাহসে কুলাইল না। ঘোড়া হইতে নামিয়া জল থামিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

এইখানেই বোধ করি একটা ভুল করিয়া ফেলিলাম, কেননা মিনিট পঞ্চাশেক পরে যখন জল থামিল তখন আর পদম্ বাহাদুরের টিকি-লেজেরও সাক্ষাৎ নাই। বরাবর আমি সমানে তাহারই পিছনে পিছনে আসিতেছি কে বলিবে? শিকার মাথায় উঠিল, এখন পদম্ বাহাদুরকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে হয়।

নিতান্ত দুই-এক মিনিট নয়, পূরা দেড় ঘণ্টাকাল সেই নির্জন পাহাড়ের অলিতে-গলিতে আমি পদম্ বাহাদুরের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলাম, চীৎকারে গলা ফাটাইয়া ফেলিলাম, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! একে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তায় আবার বেলা পড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। ভারী পরিশ্রম বোধ হইতেছিল, গাছ-গাছড়ায় ভরা একটুখানি ফাঁকা জায়গা পাইয়া জিরাইবার উদ্দেশ্যে সেখানেই ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দিলাম—এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া একটু কচি ঘাস খাইয়া লউক্।

গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিলাম, বোধ করি আয়েসে চোখ দু'টাও অল্প একটু বুজিয়া আসিয়াছিল, হঠাৎ যে দৃশ্য দেখিলাম তা ভুলিবার নয়। দুটি ভুটিয়া—তাদের একটি প্রৌঢ় ও অপরটি ছোকরা-বয়সী—দুই টাট্টুতে চাপিয়া টগাবগ্ টগাবগ্ শব্দে সহরের দিকে চলিয়াছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, কিন্তু যদি সেই লোক দুইটির মুখের পানে কেহ চাহিত তবে স্তম্ভিত না হইয়া কিছুতেই সে থকিতে পারিত না। মড়ার মুখের মত মুখ তাদের বিবর্ণ,—একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক চোখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কোনও একটা ভীষণ কিছুর হাত হইতে পরিত্রাহি ভাবে তারা যেন ছুটিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টায় আছে।

হঠাৎ আমার উপর চোখ পড়িতেই সেই প্রৌঢ় পাহাড়িয়া এক বিকট আর্তনাদ করিয়া ঘোড়ার একধারে হেলিয়া পড়িল। মানুষের উপর হিংস্র বাঘ লাফাইয়া পড়িলে মুখে-চোখে তার যে অসহায় ভাব ফুটিয়া ওঠে বইয়ের ভাষাতেই এতদিন তাহার বর্ণনা পড়িয়াছিলাম, এইবার চোখে দেখিলাম। বিদ্যুদ্বেগে লাফাইয়া আমি গিয়া তার টাট্টুর রাশ চাপিয়া ধরিলাম, নহিলে নিশ্চয়ই সে মাটীতে গড়াইয়া পড়িত। কণ্ঠস্বরটাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম

করিয়া যাবিস্তা হিন্দী ভাষায় বলিলাম, "বুড়া বাবা, এত ভয় পাইয়াছ কেন ?" ততক্ষণে কিন্তু ছোক্‌রা-বয়সী ভুটিয়াটিও ঘোড়ার রাশ টানিয়া একেবারে থামিয়া পড়িয়াছে। চাহিয়া দেখি বিস্ময়বিস্ফারিত ছুই চোখে সে যেন আমায় গিলিতেছে। তারপর ছানাবড়ার মত চোখ ছুইটী আমার মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিল, "বাবুজী, এ সময়ে আপনি এখানে ?"

আমি যে কোথায় সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ? সহর থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছি নাকি ?"

"সহর ? সহর এখানে কোথায় বাবুজী ? চার মাইলের ভেতর এখানে জন-প্রাণীর চিহ্নও নেই, শুধু বন আর পাহাড়—পাহাড় আর বন !"

চারিদিকে চাহিয়া দেখি, নিবিড় অন্ধকার গম্ গম্ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কোন্ জায়গা ?"

"রোংরু পাহাড়।" ছেলেটার গলার স্বর যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল।

রোংরু পাহাড় ! কানাই বাবুর কথা বিদ্যুতের মত আমার মনের মধ্যে দিয়া খেলিয়া গেল, সমস্ত শরীরে আমার কাঁটা দিয়া উঠিল। এই বলিষ্ঠ নির্ভীক ভুটিয়া ছেলেটা পর্যন্ত যে পাহাড়ের নাম করিতে মনে মনে কাঁপিয়া উঠে, না জানি সে কী ভীষণ স্থান !

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ছেলেটি কহিল, "বাবুজী, ভাব্‌বেন না, আপনি আমার ঘোড়ায় উঠে পড়ুন, আমি ওর লেজ ধরে ধরে দৌড়োব।"

অবাক্ হইয়া যুবক-বীরের মুখের দিকে তাকাইলাম। বাঃ, এই তো মরদের বাচ্চা। প্রকাশ্যে হাসিয়া শুধু বলিলাম, "তার প্রয়োজন নেই। তোমরা রওনা হও, আমার ঘোড়া কাছেই আছে, আমি তাতেই যেতে পারব।"

দেখিতে দেখিতে ভুটিয়াদ্বয় রাস্তার বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নির্জন হইতেই স্থানটা যে কী ভীষণ ভয়াবহ তাহা নূতন করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতে লাগিল নিবিড় অন্ধকার যেন বীভৎস দৈত্যের মূর্তি নিয়া আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিতে অগ্রসর হইতেছে। কানাই বাবুর সেই প্রেতাত্মার গল্প বার বার মনে আসিতে লাগিল, আর

বুকের ভিতরটা আমার হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তবুও দৃঢ়ভাবে বন্দুকটিকে চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিলাম, নাঃ, ভগবান্ নিজেই যখন এ সুযোগ আমায় দিয়াছেন তখন পেছ্-পাও হইব না কিছুতেই, রোংরু পাহাড়ের প্রেতাত্মার সহিত আজ আমার বোঝাপড়া করিতেই হইবে।

হঠাৎ পাশের বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল সাধারণ মানুষের ছয়-সাতটির সমান ওজনের একটি প্রাণী অন্ধকারে জঙ্গল ভেদ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে আমার পানে ছুটিয়া আসিতেছে। আমার পায়ের তলাকার মাটী কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল বন্দুক বুঝি এমনই বা হাত হইতে খসিয়া পড়ে! তবুও প্রাণপণ বলে সেটিকে উঁচাইয়া ধরিলাম।

মুহূর্ত পরেই যে জীবটী আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সাশ্চর্যে দেখিলাম সেটী আমারই ঘোড়া। কিন্তু এ কী চেহারা তার! সমস্ত শরীর অবিরত কাঁপিতেছে, নিদারুণ ভয় মুখেচোখে যেন উপ্চাইয়া পড়িতেছে। অসহায় ভাবে সে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। ইতর জীবের মুখেও যে ঠিক মানুষেরই মত ব্যাকুল ভয়-কাতর ভাব ফুটিয়া উঠিতে পারে তা সেদিন প্রথম লক্ষ্য করিলাম। সে মুখ যেন অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আমাকে ব্যগ্র ইঙ্গিত জানাইতেছিল।

একবার ভাবিলাম, আর নয়, এবার সরিয়া পড়াই মঙ্গল। যে জায়গায় দুর্ধর্ষ ভুটিয়া পাহাড়িয়া আচম্কা মানুষ দেখিয়াই ঘোড়ার গায়ে এলাইয়া পড়ে, যে স্থানে আসিয়া নিঃশঙ্ক পাহাড়িয়া ঘোড়া ভয়ে দিশাহারা হইয়া যায়, না জানি কী ভীষণ সে স্থান! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মন বলিয়া উঠিল, "কী! মরণের ভয় এতই বড় হইল? কালামুখ লইয়া ফিরিবে কোন্ লজ্জায়? যে জিনিষ বিশ্বাস কর না বলিয়া লোকের কাছে বুক ঠুকিয়া বেড়াও আজ তারই হাত হইতে পোড়া প্রাণটা বাঁচাইতে হইবে? কেন, অমন প্রাণ না বাঁচাইলেই নয়?

তড়াক্ করিয়া ঘোড়ায় পিঠে লাফাইয়া উঠিলাম, যে দিক্ হইতে ভয় পাইয়া ঘোড়াটি দৌড়িয়া আসিয়াছিল সেই দিকে আর এক পাও নড়িতে চাহিল না। অসম্মত ঘোড়াকে সামনে চালাইয়া লাইবার যত রকম কৌশল জানা ছিল সবগুলিই যখন ব্যর্থ হইল তখন অগত্যা ঘোড়া হইতে নামিয়া সেটিকে একটা গাছের ডালের সহিত বাঁধিলাম; তার পর বন্দুক হাতে একাই সামনে অগ্রসর হইতে সুরু করিলাম।

জঙ্গলের ভিতর দিয়া খানিকটা আগাইতেই যা দেখিলাম তাতে আমার সমস্ত শরীরে বার বার কাঁটা দিয়া উঠিল—দূরে বাস্তবিকই একটা কুঠির মত দেখা যাইতেছে আর তার সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা আলোর গোলা পড়িয়া; তীব্র সবুজ আলো চারিদিকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। মনে হইল, পেরেক দিয়া কে আমার পা যেন মাটীর সহিত গাঁথিয়া দিয়াছি—কোন মতে আর সামনে চলা সম্ভব নয়। তবুও মাতালের মতন টলিতে টলিতে আগাইয়া একেবারে কুঠির আসিয়া পৌছিলাম। বাবাঃ, দেওয়ালের আড়ালে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে কি ও দুটি? জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ, সাধারণ মানুষের চোখের প্রায় চার-পাঁচ গুণ বড়। দয়াময়, তুমি কোথায়? —এ কি দেখিতেছি? শুধু তো দু'টি চোখ নয়—এ যে ছায়ামূর্তি—পাদ্রী সাহেবদেরই মত সাদা আলখাল্লায় সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত। কানাই বাবু!

মূর্তি ফিরিয়া তাকাইল—সেই ভাঁটা দুইটির দৃষ্টি একেবারে আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। মুহূর্তমধ্যেই বিকট গর্জন করিয়া মূর্তি আমার দিকে লাফাইয়া আসিল। মনে হইল, আমার বুকের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুতের প্রবাহ চলিয়া গেল—আমি সেই কুঠির ধারেই ঘাসের উপর আচ্ছন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িলাম।

জ্ঞান হইলে পর চাহিয়া দেখি, তখনও রাত্রি—ছোট্ট একটা ঘরে ক্যাম্প খাটের উপর শুইয়া আছি, আর পাশে চেয়ারের উপর বসিয়া আমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে আমারই বাল্যবন্ধু ভেঙ্কট রাঘবম্। আমায় চোখ মেলিতে দেখিয়া সে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন বোধ করছ বিজয়?"

সমস্ত মাথাটা ঘুরিতে লাগিল, ভাবিলাম আমিই বা কোথায় আর মান্দ্রাজ হইতে রাঘবম্‌ই বা এখানে আসিয়া মিলিল কি করিয়া? জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আমি কোথায় রাঘবম্?"

"রোংরু পাহাড়ে।"

পাহাড়েরে নামটা শুনিয়াই আমার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। দেখিয়া রাঘবম্ হাসিয়া কহিল, "ভয় নেই গো, ভয় নেই, আমিই আজকাল এ রোংরু পাহাড়ের ভূত—অবশ্য আসল 'ভূত' নই তা বোধ করি টের

পাচ্ছ! সমস্ত ব্যাপরই তোমায় ভেঙ্গে বলছি, কিন্তু তার আগে চোঁ করে এক বাটি গরম দুধ খেয়ে নিতে হবে—দাঁড়াও, আমার চাকরকে সে ফরমাসটা করে নি।"

চাকরের হাত হইতে গরম দুধের বাটীটা আমি নিঃশেষ করিলে পর রাঘবম্ বলিতে আরম্ভ করিল,—"বোধ হয় খবর রাখ যে আজকাল আমি গভর্ণমেণ্টের কলেজে প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছি। ছোটবেলা থেকেই নানা রকম পোকামাকড়ের অনুসন্ধান করা এবং তাদের স্বভাবচরিত্র লক্ষ্য করার বাতিক আমায় পেয়ে বসেছিল। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কমা দূরে থাক, হাজার গুণ বেড়ে গেছে। কাজেই কর্মজীবনেও এদিক্‌টাই বেছে নিয়েছি। কলেজের দু'-চার ঘণ্টা লেকচার দেওয়া ছাড়া সারাদিন আমি পোকা-মাকড় নিয়ে ল্যাবারেটারীতে পড়ে থাকতাম, তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখে উৎসাহে ও আনন্দে অধীর হয়ে উঠতাম। কিছুদিন বাদে পোকা-মাকড়ের ওপর আমার একখানা বই বার হ'ল, বিলাতের বৈজ্ঞানিকেরা চিঠি লিখে আমায় জানালেন—সেখানে নাকি ভয়ানক রকম ভাল হয়েছে, আমি নাকি চেষ্টা এবং পরিশ্রম করলে এ বিষয়ে পৃথিবীর ভেতর সেরা পণ্ডিত হতে পারব।

"পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিতদের এই উৎসাহ-বাক্য আমায় যেন চাড়া দিয়ে তুলল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—এই জ্ঞানের প্রসারের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করব, কোন রকম সুখের প্রত্যাশা রাখব না, কোন রকম বিপদকেই গ্রাহ্যের ভেতর আনব না।

"ভারতবর্ষের সব চাইতে বড় বিধাতার আশীর্বাদ হচ্ছে হিমালয় পর্বতটি। কত রকম গাছ-গাছড়া এবং জীবে যে এ পর্বতটি ভর্তি তা আর কী বলব! ঠিক করলাম এই হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন কীট-পতঙ্গ নিয়েই আমার গবেষণা সুরু করতে হবে।

"এক বছরের ছুটী নিয়ে দার্জিলিং চলে এলাম। লোকালয়ে বাইরে নির্জন একটা জায়গা পেলে আমার গবেষণার কাজে সব চাইতে সুবিধে হয়—তেমন জায়গা এখানে কোথায় পাওয়া যায়? ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে একদিন এ বিষয়ে আলাপ হতেই তিনি বললেন, রোংরু পাহাড়ে একটা প'ড়ো বাড়ী আছে, সবার ধারণা সেখানে এক পাদ্রী মরে ভূত হয়ে আছে। যদি আমার ভয় না হয় তবে তিনি সেখানে সমস্ত বন্দোবস্ত

করে দিতে পারেন। ভূত জিনিষটা কোনকালেই মানি না, কাজেই তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম।

"সেই থেকে আমার বিশ্বাসী চাকর রাম পিল্লাই আর আমি এই রোংরু পাহাড়ের অধিবাসী। শেয়াল প্রভৃতি বুনো জানোয়ারের উপদ্রব থেকে রেহাই পাবার জন্যে ইলেকট্রিকের তারে সমস্ত কুঠিটা ঘিরে নিয়েছি, তারে তাদের গা লাগলেই দারুণ 'শক' খাবে। অবশ্য এটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে রাত-বেরাতে আমায় দেখে অনেকেরই সেই মৃত পাদ্রীর কথা মনে পড়ে যাবে, কেননা আমাদের গবেষণার কাজে প্যাণ্টালুনের ওপরে যে 'এপ্রন'টা পরে নিতে হয় তাতে করে আমাদের অনেকটা আলখাল্লাধারী পাদ্রী বলেই মনে হয়। অনেক রকম বিষাক্ত গ্যাস-ট্যাস নিয়ে কাজকর্ম করছি, তাই পরীক্ষার সময় চোখে লাল বিকট গগ্‌ল্‌-চশমা আর নাকে-মুখে মাস্ক্‌ বা ঢাকনিও দিয়ে থাকি—ভূতের চেহারা অনেকখানিই ওই রকমটা, নয় কি? আশেপাশের গ্রামে অনেকেই যে আমায় পাদ্রীর প্রেতাত্মা ঠাওরাচ্ছে তা বেশ বুঝি, কিন্তু তাতে আমার লাভ বই লোকসান নেই। কেননা জায়গাটা যত নির্জন হবে আমার গবেষণার কাজও ততই ভাল ভাবে চলবে।"

একটু থাকিয়া রাঘবম্‌ বলিল, "এই তো একটু আগেই দুই ভুটিয়া টাট্টু চেপে পাহাড় পার হচ্ছিল—অন্ধকার হয়ে গেছে দেখে ভয়ে তাদের মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে বেশ বোঝা গেল। সে কেবল এই আমারই ভয়ে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু ওই সবুজ আলো? ওটা কোত্থেকে আসছে?"

"ওঃ," বলিয়া রাঘবম্‌ একটু হাসিয়া কহিল, "এক রকম পোকা আছে যারা রাত্রে ছাড়া বারই হয় না। ওই তীব্র আলো তাদের ওপর ফেললে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং সময় বিশেষে বোতলে পোরা খুবই সোজা হয়ে পড়ে। কাজেই রাত্রে প্রায়ই ওটা হাতে আমি ঘুরে বেড়াই। দূরের লোকে বোধ করি আলোটাই শুধু দেখতে পায়, আমায় লক্ষ্য করে না। নিশ্চয়ই ভাবে কোন ভৌতিক আলো কুঠির চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সন্ধ্যের পর হটাৎ কোথা থেকে জিন-পরা একটা ঘোড়া ঘাস খেতে খেতে কুঠির কাছে এসে পড়ল। তারে গা লাগাতেই বিদ্যুতের দারুণ শক্‌ খেল।

সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই চোঁচা দৌড়! ঘোড়া যখন এসেছে তখন সওয়ারও নিশ্চয়ই কাছেই কাছেই কোথাও আছে ভেবে নিয়ে আমার একটু খোঁজ করা উচিৎ ছিল, কিন্তু আলস্য করে তা আর করি নি। খানিক বাদেই তুমি এলে। মিলিটারী বেশে অতদূর থেকে তোমায় অবিশ্যি চিনতে পারি নি, কিন্তু চিৎকার করে বললাম, 'খবর্দার, তাকে গা ঠেকিও না, শক্ খাবে।' বলেই দৌড়ে তোমার দিকে আসছিলাম। এর মধ্যেই কিন্তু তার ছুঁয়ে 'শক্' খেয়ে তুমি মাটিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলে। আমি আর রাম পিল্লাই ধরাধরি করে এই ক্যাম্প খাটে তোমায় এনেছি।

পরদিন স্যানিটেরিয়ামে ফিরিয়া বন্ধুদের যখন বলিলাম যে কাল সারারাত আমি রোংরু পাহাড়ের কুঠিটায় কাটাইয়া আসিয়াছি অথচ ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই তখন অবিনাশ সকলের সামনেই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিল।

বিশু-চরিত

বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সারা বাংলা দেশটা তিনি খালি ঘুরিয়াই বেড়াইতেন। আজ আছেন হয়তো বাঁকুড়ায়, রাত না পোহাইতেই বদ্‌লী হইলেন চাটগাঁয়। মারা পড়িতাম তাতে আমি বেচারী। বাবার আর কি, সামান্য একটু যাতায়াতের কষ্ট বই তো নয়? কিন্তু ভাব দেখি একবার আমার অবস্থাটা। বাঁকুড়ায় হয়তো পড়িতেছি 'দি গ্লোব রিডার', পরীক্ষার বাকী মাত্র মাসখানেক, চাটগাঁয় গিয়া দেখি সেখানে পড়ান হইতেছে 'দি টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি রিডার।' পড় এখন গোটা বইখানা এক মাসের মধ্যে! আমাদের হয়তো ফ্র্যাক্‌শনই হয় নাই, তারা হয়ত ডেসিম্যাল সারা করিয়া বসিয়া আছে! এ অবস্থায় আর ছাই পড়াশুনা কি হইবে? ক্লাস নাইনে উঠিতেই তাই ঠিক হইল বাকী বছর দুটি মামার বাড়ীতে থাকিয়া সেখানকার স্কুলে পড়িব। 'প্রি-ম্যাট্রিক' ক্লাসে উঠিয়াই তাই একদিন গাঁট্‌রী-বোঁচ্‌কা বাঁধিয়া মামার বাড়ী আসিয়া হাজির হইলাম।

স্কুলে ভর্তি হইবার আগের দিন মেজমামা ডাকিয়া লইয়া সাবধান করিয়া দিলেন, "দেখ্ কেষ্টা, বিশুর সঙ্গে কোনদিন মিশিস নে যেন, পরকাল কিন্তু তা হলে ঝরঝরে হয়ে যাবে!"

বিশু আবার কে রে? তা সে যেই হোক, তার কথা ভাবিবার আমার তখন মোটেই সময় ছিল না। কাল স্কুলে ভর্তি হইব—লক্ষ্মীছাড়া স্কুল আবার পরীক্ষা না করিয়া ভর্তি করে না—কাজেই কোন্ বিষয়ে কতটা পড়া হইয়াছে সেটা তো জানিয়া লইতে হইবে! অবিনাশ, নিমাই, বিজয় প্রভৃতিকে আসিতে বলিয়াছিলাম, তাহারা আসিয়া জুটিয়াছে। অবিনাশ বলিল, "নদী নাকি শুনলাম বেজায় বেড়ে গেছে রে! চল্, নদীর ধারে যাওয়া যাক্—বেড়ানও হবে, জল দেখাও হবে, কথাবার্তাও সেই সময়েই বলা চলবে।"

নদীর পারে আসিয়া তো চক্ষুস্থির! নদী পাগল হইয়া গিয়াছে। ঠাট্টা নয়, সত্যি কথাই। পাগল হইলে মানুষের যেমন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না যা ইচ্ছা হয় তাই করে, নদীরও হইয়াছে তাই। শুধু গর্জনের কথাটাই একবার ধর না! শোঁ—ও—ও, শোঁ—ও—ও করিয়া সে কি দারুণ শব্দ, বোধ করি দুই মাইল দূর হইতেও তাহা শোনা যায়। জলের কি ভীষণ নাচ! প্রায় হাত দশেক উঁচু হইয়া জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আর পরমুহূর্তেই আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া নদীর বুকখানা ফাটাইয়া দিতেছে। গোক্ষুর সাপের ফণার মত ঢেউগুলি সপাৎ সপাৎ করিয়া পাড়ের গায়ে ছোবল মারিতেছে, আর ঝুর ঝুর করিয়া মাটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে নদীর মধ্যে। গোটা নদীময় ঘূর্ণিপাক,—যাকে তোমরা ভাল কথায় বল আবর্ত, তাই খেলিয়া বেড়াইতেছে। তীরে দাঁড়াইতে তো আমাদের সাহসেই কুলাইল না। যদি একবার কোন গতিকে পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া যাই, আর দেখিতে হইবে না, নির্ঘাৎ মৃত্যু।—হাজার সাঁতার জানিলেও বাঁচিবার ভরসা নাই।

এমন সময় কি দারুণ ব্যাপারই না দেখিলাম! দেখিলাম, মাঝ-নদী দিয়া মানুষের মত কি যেন একটা ভাসিয়া যাইতেছে। হায় রে হায়, কোন্ হতভাগাকে বুঝি নদী টানিয়া লইল রে! এক্ষুণি সে সতেরো হাত জলের নীচে তলাইয়া যাইবে। কিন্তু একটু ভাল করিয়া তাকাইতেই দেখিলাম, লোকটা যেন সাঁতার কাটিয়া আমাদেরই দিকে আসিতেছে। সাবাস্ ভাই, সাঁতার শিখিয়াছিলে বটে! আমাদের কাছাকাছি আসিতেই কিন্তু ভয়ে আর বিস্ময়ে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইবার জো হইল। এ যে আমাদেরই সমবয়সী একটি ছেলে দেখিতেছি—দু' এক বছরের বড় হইতে পারে! মুখে তার এমনি স্ফূর্তির হাসি যে বেশ বুঝিলাম, ইচ্ছা করিয়াই নদীতে নামিয়া সে

এই সাঁতার-বাজী খেলিতেছে—কখ্‌নো সে পড়িয়া যায় নাই। বাপ্‌রে বাপ, এই নদীতে সাঁতার-বাজী! এত বড় ডান্‌পিটে ধুরন্ধর যে আমার কল্পনায়ও আসে না! কিন্তু আমি কোন কথা বলার আগেই অবিনাশ, বিজয়, নিমাই—সকলে 'হাঁ হাঁ' করিয়া ছুটিয়া আসিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "বিশু ভাই, লক্ষ্মী ভাই, উঠে পড়্‌, উঠে পড়্‌, মারা যাবি।" ওঃ, এই তবে বিশু! এতক্ষণে বুঝিলাম, কেন মেজমামা এর সঙ্গে মিশিতে এত করিয়া বারণ করিতেছিলেন।

বিশু কিন্তু উঠল না, একটু মুচকি হাসিয়া কপ্‌ করিয়া একটা ডুব দিল। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ—কোনই সাড়া-শব্দ নাই, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আমরা নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। হাত চল্লিশেক দূরে আবার কপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল। চাহিয়া দেখি, বিশু মাথা তুলিয়া ফের মাঝ নদীর দিকে সাঁতরাইয়া চলিয়া[illegible]।

বাড়ী ফিরিবার পথে সবচেয়ে প্রথমে কথা কহিল অবিনাশ। বলিল, "কি আশ্চর্য পরিবর্তন ভাই! বছর দুই আগে এই বিশু ছিল কী গোবেচারা! সাত চড়েও কথা কইতো না। আর সাহস তো ছিল না বললেই চলে! আর এখন? এখন ও না করতে পারে এমন কাজই নেই। কামানের সামনে বুক পেতে দাঁড়াতে বললেও পিছ্‌পাও হবে না।

বিজয় অবিনাশের কথায় সায় [illegible] বলিল, "হুঁ, এখন মনে হয় 'বিশে ডাকাত'ই বুঝি আবার 'বিশু' [illegible] বাঙ্গলায় এসে জন্মগ্রহণ করেছে। অথচ কি ছিল বছর দুই আগে!"

কথা কহিল না শুধু নিমাই। অবি[illegible] তাই তার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি বলিস্‌রে নিমাই?"

নিমাই জবাব দিল, "তোরা তো ওর পরিবর্তনে খুবই অবাক হয়ে গেছিস্‌। তা হবিই তো। কিন্তু কেন যে ও এ রকম বদলে গেল সে ইতিহাস যদি জানতিস্‌ তো এতে মোটেই আশ্চর্য হতিস্‌ নে। বরং এর উল্টো হলেই তোরা আশ্চর্য হয়ে যেতিস্‌।"

"কি ইতিহাস রে ভাই, কি ইতিহাস?"

"উঁহু, সে আমি কিছুতেই বলতে পারবো না, ওর বারণ [illegible]

কত বলিলাম, নিমাই কিন্তু কিছুতেই কোন খবর ভাঙ্গি[illegible]

দিন তিনেক হইল স্কুলে ভর্তি হইয়াছি। স্কুল-কমপাউণ্ডের বড় আমগাছটার তলায় ড্রিল-মাষ্টার আমাদের ড্রিল করাইতেছিলেন। একটা নূতন কায়দা দেখাইয়া দিয়া তিনি সবেমাত্র বলিতেছেন, "যেমন তরকারিতে নুন-ঝাল দিলে তার সমস্ত দোষ কেটে যায়, তেম্নি পায়ের ডিস্‌ট্যান্স বাড়িয়ে দিলে এরও সমস্ত দোষ···" অমনি তাঁর ঠিক মাথার উপরে আমগাছ হইতে একটা হনুমান 'উব্‌ উব্‌' করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ঠিক পরের মুহূর্তেই হনুমান গাছ হইতে একেবারে লাফাইয়া পড়িল—ড্রিল-মাষ্টার আঁৎকাইয়া উঠিয়া হাত দশেক সরিয়া গেলেন। ছেলের দল একসঙ্গে হাসিয়া উঠিতেই ড্রিল-মাষ্টার দেখিলেন, হনুমানটি আসলে মানুষ—তাঁরই ছাত্র, নাম শ্রীমান বিশু। বিশু কিন্তু ততক্ষণে হাত দু'টি যোড় করিয়া ও মাথাটি নীচু করিয়া ড্রিল-মাষ্টারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেন কতই না সুবোধ বালক!

মাষ্টারমশাই তখন কাছে আসিয়া খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিশু, তুমি তো আগে এ রকম ছিলে না!"

"আজ্ঞে না!"

"কিন্তু এখন যে একেবারে অধঃপাতে যাচ্ছ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

"কবে থেকে এ রকম জাহান্নামে যেতে সুরু করেছ?"

"আজ্ঞে কাল থেকে।"

ড্রিল-মাষ্টার বুঝিলেন, ছাত্রটির সঙ্গে বেশী কথা বলিয়া আর বিশেষ কোন লাভ নাই।

বাড়ী ফিরিবার সময় অবাক্ হইয়া গেলাম—অবিনাশের কথাবার্তায়। সে-ও দেখি নিমাইএর বুলি ধরিয়াছে; বলিতেছে—"বিশুর ভেতরের কথা তোরা যদি শুনিস্ তাহলে তোরাও বুঝবি, এসব ব্যাপারে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই!" 'ভেতরের কথাটা' কিন্তু সে-ও কিছুতেই ভাঙ্গিল না। দুই-দুই জন লোক একটা কথা চাপিয়া যাইতেছে, কাজেই কৌতুহলটা যে কেমন তা তো বুঝিতেই পার!

ঠিক এমনি সময়ে হাজির হইল আসিয়া বিশু নিজে। আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া বলিল, "নতুন ভর্তি হয়েছিস্ বুঝি। যতে গু'র ভাগ্নে না তুই?"

কথার ছিরিখানা দেখ না একবার! মেজমামার নাম 'যতীন', 'যতে' বলবার দরকার কি রে তোর? যতীন বলতে কি মুখে ব্যথা হয়? তারপর, মামার পদবী গুহ, গুহ-ই বলা উচিত, 'গুহ'র 'হ'টা বাদ দিলে কি বিশ্রী শোনায় বল তো! ভারী বিরক্ত হইয়া গিয়াছিলাম, তাই শুধু মাথা নাড়িয়া ছোট্ট একটা 'হুঁ' বলিয়াই চুপ করিলাম।

সাত-আট মাস কাটিয়া গিয়াছে। সহরের মাইল দুই দূরে একটা বড় খাল ছিল। বড় বলিলাম এই জন্য যে খালটা চওড়াও ছিল খুব, আর গভীরও ছিল খুব; কিন্তু জল তাতে এক রকম ছিল না বলিলেই হয়। নৌকা চালানো চলিত বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তার বেশী আর কিছু নয়। সন্ধ্যা তখনও ঠিক হয় নাই, কিছু বাকী আছে, আমি সেইখান দিয়া একদিন যাইতেছিলাম। খালের উপরেই রেলের পোল। সেদিকে তাকাইতে গিয়া দেখি, বিশু পোলের ভাণ্ড (ঐ যে প্রকাণ্ড উঁচু ধনুকের মত জিনিসগুলা—ইংরাজীতে যাকে বলে আর্চ) বাহিয়া দিব্যি উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। আগের দিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, ভাণ্ড নিশ্চয়ই পিছল হইয়া রহিয়াছে; যদি কোন মতে পা একটুখানি পিছ্‌লাইয়া যায় তো একশো হাত নীচে পড়িয়া একেবারে চুরমার হইয়া যাইবে, কেননা নীচে জল যে না থাকার মত সে তো আগেই বলিয়াছি। বিশুর কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই, খাসা বাহিয়া চলিয়াছে।

আমায় দেখিয়া বিশু নামিয়া আসিল; বলিল, 'হাঁরে কেষ্টা, তুই নাকি আমার ইতিহাস জানবার জন্যে দিনরাত অবিনাশ আর নিমেকে খোঁচাচ্ছিস? শুনতে ইচ্ছে হয়েছে নাকি তোর?"

বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, বলিলাম, "হ্যাঁ ভাই!"

"আচ্ছা চল তবে আমার সাথে শ্মশান-খোলার দিকে।"

খালের ধার ধরিয়া আমরা শ্মশান-খোলার দিকে চলিলাম। জায়গাটা বাস্তবিকই ভীষণ। আশেপাশে দু'-তিন মাইলের মধ্যে মানুষের নামগন্ধও নাই। আর মাইলটাক দূরে একটা বড় জঙ্গল, তাতে বোধ করি দিনের বেলায় হাতী-গণ্ডারও লুকাইয়া থাকিতে পারে।

বিশু আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে প্রায় মিনিটখানেক তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "দেখ, প্রায় দু'বছর হলো আমি মরে গেছি!"

একে তো সন্ধ্যাবেলা শ্মশানের কাছে বসিয়া, তাতে চারিপাশের দৃশ্যটা অমন চমৎকার। বিশুর চোখ মুখের ভঙ্গী আর কথার ধরণ শুনিয়া আমি যেন দশ হাত মাটির নীচে ঢুকিয়া পড়িলাম। ভয়ে হাঁটু দু'টা কাঁপিতে লাগিল, গলা কাঠ হইয়া আসিল, কোনমতে বলিলাম, "ও কি কথা? ওতে আমার বড় ভয় করে।"

বিশু বলিল, "কিন্তু ওই ঠিক কথা যে। আমি তো আর মানুষ নই, আমি তো ম'রে গেছি! তোর সামনে দাঁড়িয়ে এ তো মরা বিশুর প্রেতাত্মা!"

আমি আর পারিলাম না, ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তোমরা হাসিতেছ? হাস। ও অবস্থায় পড়িলে তোমরাও কাঁদিতে।

বিশু একটু নরম হইয়া বলিল, "ব্যাপারটা শোন তবে। আগে ছিলাম আমি একেবারে নিরীহ গোবেচারা। প্রথম বার যখন পরীক্ষায় ফেল হলাম তখন বাড়ীর সকলের কী টিট্‌কারী! মানুষ বলে কেউ মনে করতেই চায় না, গরু-গাধার সামিল মনে হয়, আর উঠতে বসতে খোঁটা দেয়। কপাল খারাপ, তাই পরের বছরও ফেল হলাম। আমার ছোট ভাই শিবু আমার ওপরে উঠে গেল। এবার আমার তিষ্ঠানই দায় হোলো? ঘরে টিট্‌কারী, বাইরে টিট্‌কারী, টিট্‌কারী ছাড়া কেউ কথাই কয় না। মনে বড় দুঃখু হলো, ভাবলাম, দূর ছাই, এ জীবন না রাখলে আর কি হয়? আজ জলে ডুবেই মরবো। নদীর কাছে এসে কিন্তু একটা ভারী চমৎকার কথা মনে হোলো। ভাবলাম, এমনিভাবে মরতে যাই কেন? তার চেয়ে ভাবি না কেন যে আমি মরেই গেছি! তাহলে তো পৃথিবীতে কোন কাজ করতেই আর পিছ্‌-পা হব না, কেন না মরণের ভয়ই যদি না থাকলো তবে আর কোন কাজ না করতে পারি? মরে তো আমি গেছিই, শুধু মরণের কষ্টটা তোলা রইলো। আজ না পেয়ে ক'দিন পরে সেটা পাবো! এবার এমন সব কাজ করতে আরম্ভ করবো যাতে পৃথিবীতে আমার একটা নাম থেকে যায়। সেদিন থেকেই আমি এ রকম। এখন এমন কাজ নেই যা আমি না করতে পারি। লোকে বলে আমার মত সাহসী ছেলে নাকি দেশে আর একটিও নেই! এর মধ্যেই চার-পাঁচবার খবরের কাগজে নাম্ উঠে গেছে।"

মুখ দিয়া আমি আর একটি কথাও বাহির করিতে পারিলাম না।

ঠিক এমনি সময়ে জঙ্গলের দিক হইতে একটা ভীষণ শব্দ আসিল।

আমি কলিকাতায় অনেকবার গিয়াছি, চিড়িয়াখানাও দেখিয়াছি, বুঝিতে বাকী রহিল না যে এ বাঘের গলার আওয়াজ। ভয়ে সারা শরীর কাঁপিতে লাগিল। একটা পাকা বাঁশের মোটা লাঠি শ্মশানের কাছে পড়িয়াছিল; বোধ হয় কোন হিন্দুস্থানীকে পোড়াইতে আসিয়া তাহার বন্ধুর দল তার সাধের লাঠিখানাও তারই কাছে রাখিয়া গিয়াছিল। বিশু সেখানা উঠাইয়া লইল। আবার বাঘের ডাক শোনা গেল—এবার আওয়াজ আরও কাছে। বিশু বলিল, "আজ ভোরে নিশ্চয়ই কোন ভাল লোকের মুখ দেখে উঠেছিলাম, কেন না আজ আমার জীবনের আশা পূর্ণ হবে! বাঘের সঙ্গে লাঠি হাতে লড়াই করা আমার জীবনের একটা মস্ত বড় সাধ।—তুই সাইকেল চড়তে পারিস?"

কোন মতে জবাব দিলাম, "পারি।"

"তবে এই নে চাবি। পোলের গায়ে আমার সাইকেল তালা-লাগানো আছে, খুলে নিয়ে তাতে চড়ে বাড়ী পালা।"

বিশুর কথা শেষ হইতে না হইতে আবার সেই আওয়াজ। এবার খুব কাছে। সন্ধ্যা তখন ঘোর হইয়া আসিয়াছে, বাঁশের লাঠিটা কাঁধে ফেলিয়া বিশু সেই ভীষণ জানোয়ারের উদ্দেশে জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেল।

কার দোষ

ঝাউটুলি গার্ল্‌স্ স্কুলের ছাত্রী-মহলে দস্তুরমত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—মে মাস পড়িতে-না-পড়িতেই এবার নাকি গ্রীষ্মের ছুটী সুরু হইবে। দিন কয়েক আগে তাহাদের যে প্রাইজ্ ডিষ্ট্রিবিউশন্ হইয়াছে তাহাতে সভাপতি ছিলেন মস্ত এক দেশবিখ্যাত ব্যক্তি। এই ধরণের লোক সভাপতি হইলে স্কুলের মেয়েদের কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ লেখা আছে:—

(১) সর্বপ্রথম ফার্ষ্ট্ ক্লাশের (আর্থাৎ ক্লাস টেনের) মেয়েদের মধ্যে যাহারা ভাল ইংরাজী লিখিতে পারে তাহারা একখানা দরখাস্তের খস্‌ড়া প্রস্তুত করিবে।

(২) তারপর একজন বিশেষজ্ঞ সেই দরখাস্তখানা ছাঁটিয়া-কাটিয়া ঠিক করিয়া দিবেন।

(৩) সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় বাহিরে আসার মুখে স্কুলের সব চাইতে ছোট্ট মেয়েটী সেই দরখাস্তখানা তাঁহার হাতে দিবে।

শাস্ত্রমতে এই কাজটি যথাযথভাবে করিতে পারিলেই নির্ঘাৎ এক সপ্তাহ ছুটী। ঝাউটুলি গার্ল্‌স্ স্কুলের মেয়েরা আর কিছু অশাস্ত্রজ্ঞ নয়, কাজেই 'সামার ভেকেশন'টা এক সপ্তাহ আগাইয়া আসিয়াছে। তার উপর অঙ্কের টিচার করুণা-দি বি-টি পড়িতে যাইবেন, ভেকেশনের পর আর তিনি ফিরিতেছেন না। অতএব? তাঁর 'ফেয়ার-ওয়েল' এবং আরও একদিন ছুটী,

ফলে, ফার্ষ্ট্ টার্মিনাল পরীক্ষা, যেটা বরাবর ছুটীর আগে হওয়ার কথা, সেটা বহুদিন পিছাইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য বছর এই সময়টা শোভনা বড়ই মন-মরা ভাবে কাটাইত। তার দিদি বেথুন কলেজে পড়ে, দাদা পড়ে এম-এ ক্লাসে; এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আসিতে না আসিতে তাহাদের দৌরাত্ম্যে চায়ের টেবিলে বসা শোভনার যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হইত—'ভেকেশনে' কে কোথায় যাইবে, কতদিন থাকিবে, কি ভাবে সময় কাটাইবে, তারই কেবল জল্পনা-কল্পনা। বে-শ আছে ওই কলেজের ওরা, পনেরো-বিশ দিন আগে ছুটী আরম্ভ, আবার খোলেও পনেরো-বিশ দিন পরে। এদিকে শোভনা আর সুপ্রকাশ (শোভনার ছোট ভাই) সেই সময়ে টার্নিমাল্ পরীক্ষার অত্যাচারে অস্থির। ঠিক যেন তোমাকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া সকলে রসগোল্লা খাইতেছে!

এ বছর কিন্তু দাদা-দিদিদের আলোচনায় যোগদান কারতে শোভনারও প্রবল আগ্রহ দেখা গেল। তার নিজের ইচ্ছা ছুটীতে মামাবাড়ী ঢাকায় যাওয়া হয়। এ ইচ্ছার প্রথম কারণটি 'সাহিত্যিক', অর্থাৎ সাহিত্য-সম্বন্ধীয়। শোভনা যত বার ঢাকা গিয়াছে তত বারই তার মামাতো ভাই শ্রীমান্ অমলচন্দ্রের জীবনচরিত হইতে এমন কয়েকখানা পাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে যেগুলিকে গল্পের আকারে স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপাইবার ফলে আজ বন্ধুমহলে তার খ্যাতির অন্ত নাই। সে সাহিত্যিক। তার আশা আছে, অমলচন্দ্রের দৌলতে এবারেও সে কোন-না-কোন নতুন গল্পের প্লট্ পাইবেই। দ্বিতীয় কারণ, শোভনাদের ছয় মাসী—প্রত্যেক মাসীর বাড়ী হইতে ছুটীতে অন্ততঃ দু'একজন করিয়া মামাবাড়ী বেড়াইতে আসিলেও 'ভেকেশন্'টা 'গ্র্যাণ্ড্' কাটিবে। তা ছাড়া দাদামশায়ের মজার মজার গল্প আর বুড়ীগঙ্গার মোটামোটা গল্দা চিংড়ি—কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা যে বেশি প্রশংসার যোগ্য তা বলাও ভারী শক্ত। মামাবাড়ীর একমাত্র ভয়াবহ বিভীষিকা হইতেছেন ছোটমামা। পশ্চিমের কোন্ একটা কলেজে তিনি প্রফেসার, ছুটীতে ঢাকা আসেন। পাৎলা শরীরের উপর তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটা। মাইনাস্ তেরো পাওয়ারের চশমা আঁটিয়া তিনি লাইব্রেরী-ঘরেই পড়িয়া থাকেন, রমনার অমন প্রসিদ্ধ মাঠটাতে বিকালেও একবার হাওয়া খাইতে বাহির হন না। লম্বা ছুটীর মধ্যে ভাগ্নে-ভাগ্নী-ভাইপো-ভাইঝিদের সঙ্গে তিনি মাত্র বার দু'তিন সামান্য একটু কথা কন

কিন্তু সেই সামান্য কথাগুলিই বেচারাদের বুকে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের মত গিয়া বেঁধে আর সঙ্গে সঙ্গে কচি মুখগুলি শুকাইয়া আম্‌সী হইয়া যায়। ছোটমামার কথাগুলি এই ধরনের: "কাল একবার তোদের পরীক্ষা নেব, দেখি কদ্দুর কি শিখেছিস্।" (দিদিমার মুখে শোভনারা গল্প শুনিয়াছে, ছোটমামার পরীক্ষা নেওয়ার অভ্যাস নাকি ছোটবেলা হইতেই। আট-নয় বছর বয়সে তিনি বাড়ীর একটা চাকরকে বর্ণবোধ হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। বেচারা চাকর সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া দুপুরে লুকাইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিত, ছোটমামা সিঁড়ির নীচে তাকে আবিষ্কার করিয়া দাদামশায়ের কলিকা হইতে গরম টিকা নিয়া তার গায়ে ছেঁকা দিয়া তাকে জাগাইতেন, তার পর পড়াইতে বসিতেন।)

এ বছর শোভনাকে ছুটীর আগে দাদা-দিদিদের দলে ভিড়িতে দেখিয়া সুপ্রকাশ বড়ই ক্ষুন্ন হইয়াছে। মনের দুঃখ চাপিতে না পারিয়া সে বলিয়াই ফেলিল, "ছোড়দিদি তো দিব্যি ঢাকা চল্লে, আমারই কিছু হল না।" শোভনা সহানুভূতির সুরে বলিল, "কেন, হবে না কেন? বাবা বলেছেন তোর ইস্কুলে ছুটী হলেই প্রথম যে চেনা লোক ঢাকা যাবে তার সঙ্গেই তোকে পাঠিয়ে দেবেন। ঢাকায় তো হরদমই লোক যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, আমিও যেদিন পৌঁছাব, দেখব তার পর দিনই ছোটমামা এসে হাজির!" সুপ্রকাশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল।

ঢাকায় আসিয়া শোভনা দেখিল সে যা আশা করিয়াছিল তা তো ফলিয়াইছে, বোধ করি তার চাইতে একটু বেশীই ফলিয়াছে। বাণী, ভোম্বল আসিয়াছে, ক্ষমা, নিরু আসিয়াছে, এমন কি রংপুর হইতে বিজয়, প্রতিভা এবং প্রসূনও আসিয়া পড়িয়াছে—মামাবাড়ী একেবারে সরগরম। সকলেই প্রায় সমবয়সী, তাই ফুর্তিটাও কিছু উৎকট। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় শ্রীমান্ অমল গাছ ছাড়িয়া পাকাপাকি ভাবে বাড়ীতে আশ্রয় নিয়াছে। গাছ ছাড়িয়া বলা হইল এইজন্য যে ইতিপূর্বে অমলের খোঁজ পড়িলে প্রথমে লোকে দেখিত সে গাছে আছে কিনা। গাছে না পাওয়া গেলে তখন বাড়ীর ভিতর অনুসন্ধান করা হইত। দিনের মধ্যে পাঁচ ছ'-ঘণ্টা সে যে ডালে ডালেই কাটাইত তাতে ভুল নাই। স্কুলে সে যায় কিনা? তা যায় বই কি, তবে প্রায়ই দ্বিতীয় ঘণ্টায় জল খাওয়ার ছুটি নিয়া বাহির হইয়া তৃতীয় ঘণ্টায় ক্লাসে

ফিরিয়া আসে। ছেলেরা চাপিয়া ধরিলে বলে, "জলই তো খেতে গেছলাম। জল-ঘরের জলগুলো কি মানুষ খেতে পারে? যা গরম! নারকোল গাছে উঠে তাই একটা কচি ডাব পেড়ে খেয়ে এলাম। তোদের মত ক্লাস পালাই না, জানিস্! সেটুকু কর্তব্য-জ্ঞান আমার আছে।"

কিন্তু অমলের এরূপ গভীর কর্তব্যজ্ঞান থাকা সত্বেও দুষ্ট লোকে বলে একবার নাকি পরীক্ষার হলে ইতিহাসের মাষ্টার মশায় ঘ্যাঁক্ করিয়া তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়াছিলেন—সে নাকি ঝুঁকিয়া পড়িয়া সামনের ছেলের খাতা হইতে কি দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। অমলের কিন্তু আজও বিশ্বাস সেদিন তার উপর ন্যায় বিচার হয় নাই। ওই প্রশ্নটার তো সবটাই তার মুখস্থ ছিল, —'হোয়েন্ দি ব্যাট্ল বিগ্যান' হইতে আরম্ভ করিয়া 'টেরিটারী ওয়াজ্ সিডেড্' পর্যন্ত সমস্তই—কমা, সেমিকোলোনগুলা পর্যন্ত। কেবল মাঝখানে একটা কথা ভুলিয়া যাওয়ায় সমস্ত খেই হারাইয়া ব্যাপারটা ঘুলাইয়া গিয়াছিল বই তো নয়! সে কথাটা মনে হইলেই সে আবার গড় গড় করিয়া সমস্ত শেষ পর্যন্ত লিখিয়া দিয়া আসিতে পারিত। এ অবস্থায় শুধু সেই কথাটি মাত্র দেখিয়া লওয়ার জন্য সে যদি সামনের ছেলের খাতার দিকে একবারটি তাকায় তবে কি তাহাকে নকল করা বলিতে হইবে? কিন্তু এ হেন সুযুক্তি মাষ্টার মশায় বুঝিলেন না, সোজা হেড্মাষ্টারের ঘরে তাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। অমলের বড় দুঃখ, হেড্মাষ্টার মশায়ও তার যুক্তিটা একটু তলাইয়া দেখিলেন না, তার কালো কান দুটি লাল তো করিয়া দিলেনই, তার উপর তার বাবার কাছে আবার এ-ই বড় এক চিঠি। তার ফলে সেদিন তার বাড়ীতেও কম লাঞ্ছনা হয় নাই। সে তার শোভনা-দি'র চাইতে দু'বছরের ছোট, অথচ পড়ে মাত্র এক ক্লাস নীচে। তবু দুষ্ট লোকের এমনই বদ্ স্বভাব যে দিনরাত রটনা করিয়া বেড়ায়—অমলের ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে! একেবারে নিরেট্ বোকা।

দিন আট দশ শোভনাদের বড়ই আনন্দে কাটিল, তারপর একদিন সুপ্রকাশের চিঠি আসিল, আগামী কল্য সে ঢাকা পৌছিতেছে। শোভনা অমলকে এই শুভসংবাদ দিতেই সে গাছের মগডালে উঠিয়া কয়েৎবেল পাড়িয়া আনিয়া তাহাকে খাইতে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সবাইকে জানাইয়া রাখিল কাল স্টেশনে আর কাউকে যাইতে হইবে না, সে একাই গিয়া সুপ্রকাশকে লইয়া আসিবে।

অমল পরদিন যথাসময়েই স্টেশনে গিয়া হাজির হইল, কিন্তু ট্রেন আসিতেই আগাইয়া গিয়া সবিস্ময়ে এবং সভয়ে দেখে গাড়ীর দরজা দিয়া নামিতেছেন সুপ্রকাশের ছোটমামা (তাহার ছোটকাকা)। সুপ্রকাশও পেছনে আছে বটে কিন্তু ভাবখানা তার বড়ই গোবেচারা গোছের।

প্ল্যাটফর্মের বাহিরে সুপ্রকাশকে সর্বপ্রথম নিরিবিলিতে পাইয়াই অমল প্রশ্ন করিল, "ছোটকাকার আসবার কথা তো কই জানতাম না! তোর সঙ্গে দেখা হল কোথায়?"

"গোয়ালন্দে। ব্যাণ্ডেল হয়ে নৈহাটীতে গাড়ী ধরেছেন। ষ্টিমারে উঠে এক পয়সার ডালমুঠ ভাজা কিনছি, দেখি সামনেই উনি দাঁড়িয়ে।"

"কি বল্লেন তোকে?"

"এ পর্যন্ত আমার সঙ্গে মাত্র দুটি কথা বলেছেন। প্রথম কথাটি হচ্ছে— 'সুপ্রকাশ, তোর নামের প্রকৃতিপ্রত্যয় কি বল দেখি'?"

মুখ কালি করিয়া অমল জিজ্ঞাসা করিল, "আর দ্বিতীয় কথাটা কি শুনি? জেনে রাখা ভাল, আমাকেও হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন।"

সুপ্রকাশ কহিল, "তাঁর প্রশ্নের আমি যা জবাব দিলাম তাই শুনে দ্বিতীয় কথাটা বলেছেন। সে কথাটি হচ্ছে, 'তুই একটা প্রকাণ্ড গর্দভ'।"

ইহার পর পাঁচ-সাতটা দিন শোভনাদের বড়ই উদ্বেগের সঙ্গে কাটিয়াছে; কিন্তু ছোটমামা কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতেছেন না দেখিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের ধারণা হইল এবারকার ফাঁড়াটা বুঝি তবে কাটিয়াই গেল। কিন্তু অষ্টম দিনে বেচারীরা বুঝিতে পারিল ভবিতব্যের উপর মানুষের কোন হাত নাই। কেন না সেদিন সন্ধ্যার পরই ছোটমামা নোটিশ দিলেন, আগামী শনিবার এবং রবিবার সকলের একত্রে ইংরাজী এবং অঙ্কের পরীক্ষা লওয়া হইবে।

সে সপ্তাহের শনিবারটা যেন বড়ই শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া পড়িল। খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে কাগজ পেন্সিল নিয়া লাইব্রেরী ঘরে ছোটমামার কাছে উপস্থিত হইল। তিনি ইংরাজীতে কি কি প্রশ্ন উত্তর করিতে হইবে বলিয়া দিয়া প্রকাণ্ড একখানা মোটা বই হাতে ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই তাঁর গতিক দেখিয়া বোধ হইল সেখানে কড়ি-বরগা ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাঁর আর হুঁশ হইবে না।

খস্ খস্ করিয়া সকলে লিখিয়া যাইতেছে, হঠাৎ শোভনার মনে হইল তার পায়ে কে যেন অনবরত ধাক্কা মারিতেছে। পাশে ফিরিয়া তাকাইতেই শ্রীমান্ অমলচন্দ্র মিনতিপূর্ণ চোখে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "এ ভাই শোভনা দি, খাতাটা এ পাশে আর একটু কাৎ করে ধর না!"

শোভনা দারুণ ভয় পাইয়া আড়চোখে একবার ছোটমামার দিকে তাকাইল তারপর বিরক্তির সঙ্গে বলিল, "আঃ এ কি হচ্ছে অমল, টোকাটুকি কি? নিজে লেখ না!"

কিন্তু অমল নাছোড়বান্দা। শোভনা বুঝিল নীতির দিক দিয়া অমলকে বুঝাইয়া বিশেষ লাভ নাই, ভীতির দিক দিয়া গেলে যদি কিছু হয়। তাই বলিল, "তোর লেখা আমার লেখার সঙ্গে অবিকল মিলে গেলে ছোটমামা যে সব টের পেয়ে যাবেন—এটা বুঝছিস্ না?"

"তুমি সে ভাবনা ভেব না শোভনা দি, আমি জায়গায় জায়গায় বদলে-সদলে ঠিক নিজের মত করে খাড়া করে দেব। ধর না একটু কাৎ করে।" বলিয়া নিজেই সে শোভনার খাতাখানা নিজের মনোমত ভাবে হেলাইয়া দিল।

পরদিনকার পরীক্ষায় শোভনা ইচ্ছা করিয়াই অন্য দিকে গিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু অমলকে ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ নয়। সে বাণীকে জানালা বন্ধ করার ছুতায় উঠাইয়া দিয়া সেই ফাঁকে খপ্ করিয়া তার জায়গায়, অর্থাৎ ঠিক শোভনার পাশে বসিয়া পড়িল। তারপর আবার পূর্বদিনকার মত ব্যবস্থা।

তিন দিন পরে ছোটমামা পরীক্ষার খাতা ফেরৎ দিলেন—প্রথমে বাহির হইল অঙ্কের ফল। অঙ্কে শোভনা পাইয়াছে চুরাশি, অমল পাইয়াছে শূন্য।

খাতা ফেরৎ দিয়া ছোটমামা ঘরের বাহির হইতেই অমল ঘরময় নাচিতে আরম্ভ করিল—চেঁচাইয়া বলিল, "এ কি সাংঘাতিক কথা! শোভনাদির খাতা দেখে সবগুলো অঙ্ক টুকে দিলাম; ও পেল কিনা চুরাশি আর আমি সেখানে শূন্য! চুয়াত্তর, চৌষট্টি, না হয় চুয়ান্ন হলেও বা একটা কথা ছিল, একেবারে গোল্লা হয় কি বলে। নিশ্চয়ই ছোটকাকার কোথাও ভুল হয়েছে।"

অমলের বক্তৃতা শুনিয়া অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের তো চক্ষুস্থির! সুপ্রকাশ কহিল, "বলিস্ কি! ছোড়দির খাতা দেখে আগাগোড়া ঝাড়া টুকলিফাই করে দিয়েছিস্?"

অমল বলিল, "দিয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা কর না শোভনাদিকে।"

শোভনা অমলের খাতাখানা টানিয়া নিয়া কহিল, "দেখি কি হয়েছে।" তারপর খাতার উপর মিনিটখানেক চোখ বুলাইয়া কহিল, "এ কি, এ করেছিস কি? সাত আর পাঁচ-এ যোগ করে বারোর দুই বসবে, ছয় বসিয়ে রেখেছিস কেন? এখানেও তো আবার গলদ দেখছি—আট-আটে চৌষট্টির চার বসবে, বসিয়ে রেখেছিস্ সাত।"

অমল সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল, "তুমিই তো অবিকল নকল করতে বারণ করলে। সেই জন্যেই তো আমি মাঝে মাঝে একটু-আধটু বদলে দিয়েছি।"

অমলের কথা শুনিয়া সকলে হো হো শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

নিরু বলিল, "তুই কি আস্ত গাধা নাকি রে? এতদিনে বুঝলাম কেন সবাই তোকে নিরেট বলে।"

প্রসূন বলিল, "বোকারাম, অঙ্কের মধ্যে আবার বদলে দিলে তার আর রইল কি রে?"

শোভনা বলিল, "ও হরি, এমন পণ্ডিত তুমি, তা তো জানতাম না।"

অমল কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সমস্ত দোষ বিলকুল শোভনার ঘাড়ে চাপাইয়া দিল। সেই তো তাকে অবিকল নকল করতে বারণ করিয়াছে। নিজে দোষ করিয়া এখন অমলকে বোকা বলিতেছে। "যাও যাও, ঝাউটুলি ইস্কুলের ও-রকম চালিয়াতি তার ঢের ঢের দেখা আছে।"
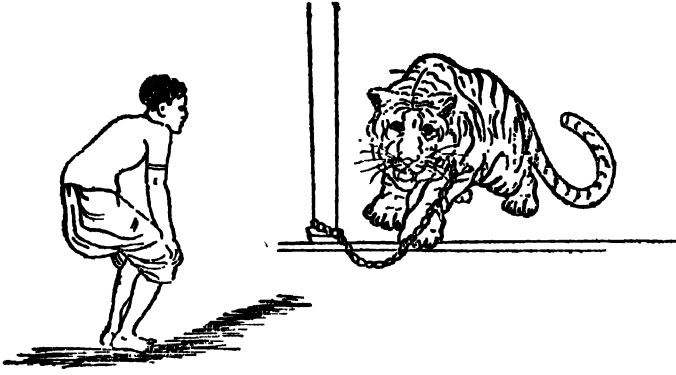
বাঘের বাচ্চা

প্যারীদা আসলে কিন্তু আমাদের দাদা-টাদা কিছুই নয়। যখন ছোট ছিলাম, সে ছিল আমাদের বাড়ীর চাকর, তার উপর ছিল বাড়ীর ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' করার ভার। সেই হইতে যে একবার তাকে দাদা বলা সুরু করিয়াছি, আজ পর্যন্ত আর সে অভ্যাসটা গেল না।

আমাদের প্যারীদার কখন্ যে কি খেয়াল হইত তা দেবতারা পর্যন্ত টের পাইতেন না, মানুষ তো কোন ছার। আমাদের বাড়ীতেই তখন সে চাকরী করিত, হঠাৎ কি এক দরকারে একদিন সে কলিকাতা গেল। ঘরের কাছেই কলিকাতা, যাওয়া-আসায় কোনই অসুবিধা নাই, কিন্তু পরদিন যখন সে ফিরিল তার চেহারা দেখিয়া তো আমাদের চক্ষু ছানাবড়া। প্যারীদার মাথার উপর ইয়া বড় পাগড়ী উঠিয়াছে, পরনে ঢিলা ইজার, গায়ে আচকান— শুনিলাম সে নাকি একেবারে গোমেজ সাহেবের চাপরাশির কাজে ভর্তি হইয়া আসিয়াছে। সবার চাইতে আমার উপরেই প্যারীদার টানটা ছিল একটু বেশী, তাই একটা গোপনীয় কথাও চুপি চুপি আমাকে সে বলিয়া ফেলিল— সাহেব নাকি তাকে কথা দিয়াছেন শীগগিরই যখন তিনি বিলাত যাইবেন তখন প্যারীদাকেই তাঁর খাস্ খানসামা করিয়া লইবেন। বিনি-পয়সায় অমন দেশটা দেখিতে পাইবে তাই প্যারীদা সে লোভ আর ছাড়িতে পারে নাই সাহেবের কাজে একেবারে ভর্তি হইয়া আসিয়াছে।

মাস কয়েক পরে একদিন প্যারীদার ভাইপো হলধরের সঙ্গে দেখা। হলধরকে যেন বড়ই বেজার বেজার মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তার মনে আর মোটেই সুখ নাই—তার কাকা প্যারীলালের নাকি জাত গিয়াছে। সাহেবের বাড়ী কাজ করার পর এখন দুই বেলাই নাকি সে মুর্গী খাইতে সুরু করিয়াছে।

তারপর বহুদিন পর্যন্ত—প্রায় দশ বছর—প্যারীদার কোন খবরাখবর পাই নাই। মনে করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই সে এতদিনে গোমেজ সাহেবের সঙ্গে বিলাত চলিয়া গেছে। হঠাৎ কিন্তু একদিন হগ্ সাহেবের বাজারে তাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "কি প্যারীদা, বিলেত থেকে ফিরলে কবে?"

প্যারীদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল, "আর দাদাবাবু গোমেজ-ট্যাস্টার কথা আর বলবেন না। ব্যাটার নিজেরই ভারী ক্ষ্যামোতা বিলেত যাবার, তা ও আবার আমায় দেখাবে বিলেত।"

"তবে ছিলে কোথায় এদ্দিন? একদিনের তরেও তো দেখতে পাইনি।"

"দেখবেন কোত্থেকে দাদাবাবু, শুধু বাংলা মুলুকে কি আর বসেছিলাম? বুলক্ সাহেবের সঙ্গে দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই, মাদ্রাজ করে বেড়াচ্ছি যে।"

"বুলক্ সাহেব? ম্যাজিক্ওলা বুলক্।"

"ঠিক ধরেছেন, সে-ই। তা দাদাবাবু, বিলেত যেতে পারি আর নাই পারি আপনাদের কল্যাণে এ দেশটা খুব একচোট বেড়িয়ে নিইছি।"

আরও কিছুদিন গেছে, গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, প্যারীদা নাকি তার সাহেবের কাজে জন্মের মত ইস্তফা দিয়া সম্প্রতি বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে। বিকালে একদিন নদীর ধারে তার সাক্ষাৎ মিলিল, অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে সে মাছ ধরিতেছিল। তিন ঘণ্টার চেষ্টায় তিনটি পুঁটি মিলিয়াছে, কিন্তু তবুও তার উৎসাহের অন্ত নাই। আমায় দেখিয়া প্যারীদা বলিল, "পেন্নাম হই দাদাবাবু! শুনেছেন বোধ হয়, গোলামী ছেড়ে দিয়ে এসেছি···তবে কাল আর একবার কল্‌কাতায় যেতে হচ্ছে।"

"কেন গো, এবার আমেরিকা পাড়ি দেবার মতলব করেছ নাকি?"

প্যারীদা দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "না দাদাবাবু, সে সব নয়। আমার ম্যাজিকওলা মুনিব বুলক্ সায়েব একবার স্মরণ করেছে। সায়েব আমার

ভারী ভালবাস্তো কিনা, তাই বিদেয় দেবার সময় চমৎকার একটা জিনিষ বিখ্‌শিশ দেবে বলেছে। আন্দাজ করুন তো কি জিনিষ সেটা দাদাবাবু।"

"তা কি করে বলি? গায়ের পুরোনো কোট্‌-টোট্‌ নাকি?"

প্যারীদা আবার দাঁত বাহির করিয়া কহিল, "না, একেবারে নতুন ধরণের জিনিষ—একটা বাঘের বাচ্চা!"

কী সর্বনাশ! গাঁয়ের ভিতর বাঘের বাচ্চা আনিয়া প্যারীদা শেষটায় আমাদের পরকালের ব্যবস্থা করিতেছে নাকি? লোকে বলিতেই বলে সাপ আর বাঘ। এ দু'টী জীব না করিতে পারে এমন কাজই নাই—তা সে বাচ্চাই হোক, আর ধাড়িই হোক্।

প্যারীদাকে বলিলাম, "তুমি ক্ষেপেছ প্যারীদা, এ সব গাঁয়ে কখনোও জানোয়ার আন্‌তে আছে? একবার ছুটে পালালে লোকের দশা কি হবে বল দেখি?"

প্যারীদা হাসিয়া জবাব দিল, "সে কথা কি আমি ভাবি নি দাদাবাবু? ভেবেছি। গরীব মানুষ আমি, বাঘ পোষার 'ক্ষ্যামোতা' কোথা আমার? খাওয়াব কি তাকে? তবে কি জানেন, বাঘটা নিতান্তই বাচ্চা, আর সায়েবও নিজে মুখে ভেঙ্গে বল্‌ছে। তাই ভাব্‌ছি, নিয়ে তো আসি গে' আপাততঃ, একটু বড় হলেই কল্‌কাতা গিয়ে বেচে দেব। হাতে কিছু টাকা আস্‌বে'খন।"

ঢের বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন কাজ হইল না। শুনিলাম প্যারীদা একদিন সত্যি সত্যিই কলিকাতা গিয়া বাঘের বাচ্চা নিয়া আসিয়াছে। কথাটা ঠিক কিনা জানিতে প্যারীদার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি, গলায় লোহার শিকল বাঁধা বাস্তবিকই একটি বাঘের ছানা। বয়স অল্প, তাই মানুষকে এখনও সমীহ করিয়াই চলে। প্যারীদা দিব্যি তার গায়ে যখন তখন হাত বুলাইয়া তোয়াজ করিতেছে। ডান কানটা অর্ধেক কাটা, নহিলে বাঘটাকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যাইত। কিন্তু হাজার হোক, বাঘেরই তো বাচ্চা, তার মুখের সেই হিংস্র হাবভাব যাইবে কোথায়? গাঁয়ের যেখানে যত মরা ইঁদুরের খোঁজ প্যারীদা পাইয়াছে, সব আনিয়া জড় করিয়াছে। কোথা হইতে পাঁঠার নাড়ীভুঁড়ি কিছু সংগ্রহ করিয়াছে। জলযোগের এই বিপুল আয়োজনে বাচ্চা বাঘের ভারী ফুর্তি; মাঝে মাঝে

আহ্লাদের চোটে সে এক একটা হুঙ্কার যা দিতেছে তাতেই আমাদের চক্ষুস্থির।

সেদিন আর কালী পণ্ডিত মশায়ের পাঠশালা বসিল না। পণ্ডিত মহাশয় ঢের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু একটি পড়ুয়াকেও ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না, সবাই হল্লা করিয়া প্যারীদার বাড়ীর দাওয়ায় বাঘ দেখিতে আসিয়া জুটিল—পুঁচকে, ফচ্‌কে, পটলা সবাই। প্যারীদা মহা ব্যস্ত। এদিক দিয়া হয়তো পুঁচকে তার বুড়ো আঙুলটি বাঘের সামনে নাচাইতেছে, বাঘ ঘোঁৎ করিয়া উঠিল; প্যারীদা অমনি পুঁচকের কাছা টানিয়া তাকে সরাইয়া আনিল। ঠিক সেই সময়েই হয়তো ওদিক দিয়া ফচ্‌কে বাঘের লেজে মারিয়াছে টান। বাঘ বিরাট লাফ দিয়া তার ঘাড়ে পড়ে আর কি! ওকে বকুনি, একে ধমক, প্যারীদা মহা অস্থির।

ব্যাপার বড় সুবিধার বোধ হইল না। প্যারীদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "তাই তো প্যারীদা, ছেলেপেলের গাঁ, তুমি এক বাঘের বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হলে, কখন কি বিপদ-আপদ ঘটে তাই ভাবছি।"

প্যারীদা জবাব দিল, "বাঘ আর ক'টা দিন দাদাবাবু? একটু বড় হলেই আলিপুরের বাগানে বেচে দিয়ে আসব।"

দিন দুই বাদে ঘুম হইতে উঠিয়া চায়ের পেয়ালা নিয়া সবে বসিয়াছি, এমন সময় ছোটকা হাঁফাইতে হাঁফাইতে এক ভয়ানক খবর আনিয়া দিল—কাল রাতে নাকি প্যারীদার বাচ্চা বাঘ শিকল ছিঁড়িয়া সরিয়া পড়িয়াছে। হাতের চা হাতেই রহিয়া গেল, মুখে আর উঠিল না। কী দারুণ খবর! গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা হামেশা এখানে ওখানে যাইতেছে—কেউ যায় মাছ ধরিতে নদীর পাড়ে, কেউ যায় পাখীর ছানা পাড়িতে মাঠ ছাড়াইয়া বহু দূরে—কখন কোনটা বাঘের হাতে ঘা'ল হয় কে জানে! হইলই বা বাচ্চা বাঘ, লোহার শিকল ছিঁড়িয়া যে সট্‌কাইতে পারে সে যে এক থাবায় যে কোন ছেলেকেই কাৎ করিয়া দিবে সে সম্বন্ধে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে? সারা গাঁয়ে না আছে ছাই একটা বন্দুক, না আছে বন্দুক ছুঁড়িতে পারে এমন একটা লোক। ইচ্ছা হইতেছিল তখনই গিয়া প্যারীদার দুই গালে দুই চড় কষাইয়া দিয়া আসি।—হতভাগা গুলিখোর,

বার বার নিষেধ করিলাম, শুনিলি না, কোথা হইতে এক সর্বনেশে জানোয়ার আনিয়া সারা গাঁ-টাকে এখন ভাবাইয়া মারিতে বসিয়াছিস্!

খুব রাগ করিয়াই প্যারীদার বাড়ীর দিকে চলিলাম। ভাবিয়াছিলাম গালি দিয়া ভূত ভাগাইয়া দিব, কিন্তু সেখানে গিয়া প্যারীদার চেহারা দেখিয়া আর গালি দেওয়ার ইচ্ছা রহিল না—অনুতাপে ও আফ্‌শোষে বেচারা এতটুকু হইয়া গেছে। হারানো বাঘকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টার সে কিছুমাত্র কসুর করে নাই—সারা রাত জাগার ফলে এবং দারুণ দুশ্চিন্তায় মুখখানা তার এমনই শুকাইয়া গেছে যে দেখিলে কষ্ট হয়।

যতদূর সম্ভব গাঁয়ের সবাই লাঠিসোটা নিয়া বাঘের খোঁজ করা গেল, যেখানে যেখানে তার লুকাইয়া থাকা সম্ভব সব জায়গাগুলিই মোটামুটি পরীক্ষা করা হইল, কিন্তু বাচ্চা বাঘের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। ভাবিলাম, যাক্ আপদ্ দূর হইয়াছে—ছাড়া পাইয়া সে কোথায় পালাইয়াছে কে জানে, মোদ্দা এ গাঁয়ে সে আর নাই নিশ্চয়ই।

কিন্তু দিন দুই বাদে ভোর হইতেই একদিন দেখা গেল আমাদের অনুমান একেবারেই ভুল, বাঘ গাঁয়েরই ধারে-পাশের কোন জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়া আছে। গভীর রাতে ছিদাম মণ্ডলের বাড়ীর কাছে তার গলার আওয়াজ পাওয়া গিয়াছে—ছিদাম আর তার ছেলে পরাণ সড়্‌কি নিয়া তখনই বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার আগেই ব্যাঘ্রচন্দ্র দু'টি হাঁস মুখে নিয়া চম্পট্ দিয়াছেন। হাঁসের খোপের পাশে কতগুলি শাদা পালক পড়িয়া, জমিতে তখন পর্যন্ত রক্তের দাগ।

ব্যাপার শুনিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল, মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। ছিদাম মণ্ডল প্যারীদাকে গরম গরম অনেকগুলি বুলি শুনাইয়া দিল। বাঘ সরিয়া পড়ার পর হইতেই প্যারীদার মেজাজ ভাল ছিল না, এইবার তার মুখ দেখিয়া মনে হইল একবার সে জানোয়ারটির সাক্ষাৎ ফের পাইলে হয়, প্যারীদা তাকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিবে।

সেদিনই আমাদের পরামর্শ-সভা বসিল। দলের পাণ্ডা কেষ্ট—ভারী যোয়ান—সে বলিল, "গাঁয়ের ভেতর রাত্তিরে বাঘ ঘুরে বেড়াবে,—আর আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবো, এ তো হতে পারে না! আজ রাতে আমরা লাঠি-সোটা নিয়ে সজাগ থাকব, বাঘ এলেই তার মাথা চৌচির করে দিতে হবে। কেমন রাজী সবাই?"

সকলেই রাজী হইয়া গেলাম। সন্ধ্যার পর যার যা হাতিয়ার ছিল সঙ্গে নিয়া সবাই একত্র হইলাম, কিন্তু বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল না। একদিন বাদেই কিন্তু আবার সকলে সভয়ে দেখিলাম ফের উপদ্রব সুরু হইয়াছে—রাস্তার ধারে একটা ছাগলের শরীরের খানিকটা অংশ। মাংস সবটাই বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে, শুধু হাড়, চামড়া, শিং ইত্যাদি পড়িয়া আছে আর আছে সমস্ত জায়গাটাতে চাপ চাপ রক্ত। সে পাড়ার লোকেরা বলিল, গভীর রাতে বাঘের গর্জন এবং ছাগলের চীৎকার দুই-ই তারা স্বকর্ণে শুনিয়াছে।

আমাদের দল আবার সজাগ হইয়া উঠিল, কিন্তু ক্ষুদে বাঘ ধরা দিল না। প্যারীদাও কম রাত্তির লাঠি হাতে বাঘের খোঁজে কাটাইল না, কিন্তু সবই বৃথা।

দুনিয়ার জীবের মধ্যে বুদ্ধিতে মানুষ যে সবার সেরা এ কথা কেউই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু এর পর পূরা একটী মাস ধরিয়া ছোট্ট একটা বাঘের বাচ্চা আমাদের এক গাঁ লোককে যে ভাবে নাকাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল—তাতে সে ধারণা আমাদের প্রায় উল্টাইয়া যাইবার জো হইল। এই এক মাসে গাঁয়ের আরও কত হাঁস, পাঁঠা যে মারা পড়িল তা আর কি বলিব। কেষ্টর দল লাঠি-সড়্কি নিয়া গ্রামের এক দিকে পাহারা দেয়, আর অন্য দিক্ হইতে শব্দ আসে—"হালুম!" লোকে ভাবনায় অস্থির হইয়া গেল। আজ যেন বাঘ ছোট আছে, কিন্তু কাল যখন একটু বড় হইয়া মানুষ-গরু নিয়া টানাটানি করিবে, তখন? শিকারীদের কাছে খবর গেল, কিন্তু আসি আসি করিয়া তারাও যেন আসে না!

সেদিন ঘরে বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছি, হঠাৎ চুপি চুপি কেষ্ট আসিয়া হাজির। খবর কি জিজ্ঞাসা করিতেই সে জানাইল, বাঘের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারী ধড়িবাজ জানোয়ার, সোরগোল করিলেই সে লুকাইয়া পড়িবে। বাঘ ধরার ইচ্ছা যদি থাকে তবে খাওয়াদাওয়ার পর শক্তমত একটা লাঠি হাতে তার জন্য যেন অপেক্ষা করি; সে আসিলে দুই জনে একত্রে বাহির হইয়া পড়িব। ব্যাপারটা পাঁচ কান না হওয়াই ভাল, কেননা বেশী গণ্ডগোল হইলে সে সেয়ানা জানোয়ার ধরা বড় সহজ হইবে না—ভারী চতুর জীব কিনা!

জবাব দিতে আমি কিছু দেরী করিতেছি দেখিয়া কেষ্ট একটু হাসি চাপিয়া বলিল, "ভয় খাচ্ছিস্ কেন রে? ছোট্ট একটা বাঘের বাচ্চা বই তো নয়! এদিকে আমরা দু' দু'জন পালোয়ান!"

এর পর অস্বীকার করিলে আর মান থাকে না, রাজী হইতেই হইল।

রাত সাড়ে দশটার পর আমি আর কেষ্ট গাঁয়ের বড় বটগাছটার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—চারিদিক্ গভীর অন্ধকারে নিস্তব্ধ, চোখে যেন কিছু মালুম আসে না। সত্যি কথা বলিতে কি, বড়ই ভয় হইতেছিল, অন্ধকারে কোন্ সময় যে বাঘের পো ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে কে জানে? কেষ্ট বলিল, "দাঁড়া এখানে; যাই চোখে দেখিস্ না কেন, চীৎকার করবি না, খবর্দার!"

আধ ঘণ্টাটাক সেই অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া আছি—দেখি কে যেন ধীরে ধীরে রাস্তা ধরিয়া আমাদেরই দিকে আসিতেছে। কাছে আসিতে অন্ধকারেও বুঝিলাম লোকটী প্যারীদা—বলিতে ভুলিয়াছি, বড় বটগাছটার কাছেই প্যারীদার বাড়ী। হাতে লাঠি দেখিয়া বুঝিলাম, আমাদের মত প্যারীদাও বাঘের খোঁজে বাহির হইয়াছে। সেই কথাটাই বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু কেষ্ট তাড়াতাড়ি তার ঠোঁটের উপর তর্জনী চাপিয়া আমায় চুপ্ করিতে বলিল। প্যারীদা আগাইয়া চলিল, কেষ্টর সঙ্গে আমি তার পেছু পেছু চলিলাম। হামিদ শেখের বাড়ীর কাছে আসিয়া প্যারীদা হঠাৎ ঘরের আড়ালে মিনিট খানেকের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন সে আবার দেখা দিল তখন বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া দেখি, সে তার ডান হাতের মুঠার মধ্যে খুব বড় একটা মুর্গীর গলা চাপিয়া ধরিয়া আসিতেছে। হাতের চাপুনিতেই বোধ করি মুর্গীটার দম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তার গলা দিয়া কোন আওয়াজ বাহির হইল না। প্যারীদা তখন তাড়াতাড়ি তার গা হইতে কতগুলি পালক খুলিয়া মাটিতে ছড়াইয়া দিল, আর সেই সঙ্গে বাঁ হাতের একটা বোতল হইতে লাল মত কি একটা তরল জিনিষ মাটিতে ঢালিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া আমি তো 'থ' হইয়া গেছি। কিন্তু ঠিক তার পরেই প্যারীদা আরো যে একটি কাণ্ড করিল তাতে 'থ' বলিলেও ঠিক হয় না, আমি একেবারে 'দ' হইয়া গেলাম। মুর্গীটিকে বগল-দাবা করিয়া হামিদ শেখের বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই প্যারীদা গলা দিয়া আওয়াজ ছাড়িল—"হালুম!" অবিকল একটি বাচ্চা বাঘের গলার আওয়াজ। মানুষে সে আওয়াজ করে কি করিয়া?

ঠিক সেই মুহূর্তেই কেষ্ট গিয়া পেছন দিক্ হইতে প্যারীদাকে একেবারে জাপ্টাইয়া ধরিয়া কহিল, "ধন্যি তুমি ম্যাজিক্ওলা মুনিবের কাছ থেকে হরেক

রকম জন্তু-জানোয়ারের ডাক শিখেছ প্যারীদা, আর ধন্যি বলি তোমার নোলাখানাকে—যা সায়েব-বাড়ীর মুর্গী-মাটন খেয়ে খেয়ে এতটা বেড়ে গেছে যে পুরো একটি মাস ধরে এক গাঁয়ের হাঁস-পাঁঠা সাব্‌ড়েও এই গরীব বেচারীর মুর্গীটা নইলে ঠিক থাকতে পারছে না। যা হোক্, বেচারা বাঘের ছানার ওপর মিছিমিছি দোষ চাপিয়ে আড়ালে আড়ালে এক মাসের খ্যাটোন্ যোগালে ভাল!"

প্যারীদার বগল হইতে মুর্গী এবং হাত হইতে লাঠি ও রংয়ের বোতল একই সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া গেল। যেভাবে আমাদের দিকে সে তাকাইতে লাগিল তাতে ও অবস্থাতেও আমি আর হাসি চাপিতে পারিলাম না।

*　　*　　*

সে রাত্রে বাড়ী ফেরার পর হাত-মুখ ধুইয়া কেষ্ট বলিল, "আরে ভাই, আমিই কি জানি ওর পেটে এত বিদ্যে? কাল গেছ্‌লাম কল্‌কাতা—বিমল বাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। দেখি কিনা তাঁর বাড়ীর বারান্দায় লোহার শেকলে এক বাঘের বাচ্চা বাঁধা! চেহারাটা দেখে আর বিশেষ করে ডান কানটা কাটা লক্ষ্য করে আমার কেমন খট্‌কা লাগ্‌ল—এইটেই না প্যারীদার সেই হারানো বাঘ যার খোঁজে আমরা হয়রান হয়ে বেড়াচ্ছি? কৌতুহল চেপে রাখতে পারলাম না, বিমল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ বাঘের ছানাটা তিনি পেলেন কোথা। সে কথায় বিমল বাবু কি জবাব দিলেন জানিস্? বল্লেন, বুলক্ নামে এক ম্যাজিক্‌ওলা সাহেবের চাপরাশী প্যারীলালের কাছ হতে তিনি ওটা তিরিশ টাকায় কিনেছেন। আমার বুকের ভেতর খচ্ করে উঠ্‌ল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কদ্দিন হ'ল কিনেছেন?' বিমলবাবু বল্লেন 'তা মাস খানেক হতে চল্ল। সাহেব নাকি প্যারীলালকে বাঘটা বখ্‌শিস্ দিয়েছিলেন। সে আর ও বাঘ নিয়ে কি করবে—আমায় চিন্‌ত, এ বিষয়ে আমার যে একটু সখ-টখ আছে সে খবরও রাখ্‌ত কাজেই সাহেবের কাছে এটা পেয়েই সোজা আমার কাছে চলে এসেছিল। আমি অবশ্য টাকা দিয়ে তখনই রাখতে চাইছিলাম, কিন্তু ও বল্লে, দিন তিনেক বাদে ফের এসে টাকা নিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে ছানাটাকেও দিয়ে যাবে; তাই করলে।' বিমল বাবুর কাছে এই ঘটনাটা শোনার পর সমস্ত ব্যাপারটা তখন বোঝা গেল। প্যারীদা মনে মনে ঠাউরে বসেছিল এই বাঘের ছানা থেকে সে একেবারে ডবল লাভ করবে। এক, এটাকে বেচে টাকা তো পাবেই, তা ছাড়া আরো

একটা ফন্দি! সাহেব-বাড়ী কাজ করে মাংস খাবার জিভটা ওর বড় বেড়ে গেছে। কিন্তু গরীব মানুষ, চাক্‌রী ছেড়ে এখন রোজ রোজ মাংস যোগায় কোত্থেকে? ফন্দিটা হ'ল এই: বাঘটাকে দিন তিনেক রেখে হঠাৎ একদিন রটিয়ে দেবে সেটা শেকল ছিঁড়ে পালিয়েছে! ব্যস্‌, তারপর মজাসে গাঁয়ের হাঁস-পাঁঠা-মুর্গী রাতারাতি গেরস্তের বাড়ী থেকে সরাও। কেউ আর অপর কাউকে সন্দেহ কর্‌বে না, সবাই বাঘের ঘাড়ে দোষ চাপাবে। প্যারীদার আরো একটু সুবিধে হয়ে গেল এই, যে, ম্যাজিক্‌ওলার কাছে থেকে তাদের মত নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের আওয়াজের নকল করতে সে শিখেছে। কাজেই মাঝ রাতে গোটা দু'চ্চার বাঘের আওয়াজ কর্‌লেই হ'ল, লোকে ভুলেও বাঘ ভিন্ন অপর কাউকে সন্দেহ করবে না। আর দুপুর রাতে ঘুরে বেড়াবার তো তোফা কৈফিয়ৎই আছে—বল্লেই হ'ল হারানো বাঘটার খোঁজ করছি!—কেমন, প্যারীদাটি তোমার একখানা চীজ নয় কি?"

সেদিন হইতে আমাদের গাঁয়ে আর বাঘের উৎপাত শোনা যায় নাই। শুনিলাম, প্যারীদা নাকি সেদিনই গাঁ ছাড়িয়া তার মনিব বুলক্‌ সাহেবের কাছে চলিয়া গিয়াছে—বলিয়া গিয়াছে, পাড়াগাঁয়ে আর বাস করা চলে না—যা ম্যালেরিয়া!

ফটু

তার আসল নাম হরেন্দ্র বা হীরেন্দ্র এই রকমই একটা কিছু হইবে কি যে তা' আজ আর ঠিক মনে পড়িতেছে না। না পড়িবার কথাই বটে। ইস্কুলে ভর্তি হইবার পর তাকে বিটু ভিন্ন অপর কোন নামে কেউ কখনো ডাকে নাই। বছর তের-চৌদ্দ বয়সের লিক্‌লিকে চেহারার ছেলেটি, হঠাৎ দেখিলে নিশ্চয়ই বলিবে দশ বছর। ঐ চেহারার উপরই আবার বেশ একটু গোঁফ উঠিয়াছে॥ ভর্তি হইবার সময় মাথার চুলগুলি ছিল কদম ফুলের মত খাড়া খাড়া, চোখে আবার চশমা আঁটা।

কোন নতুন ছেলে ক্লাসে ভর্তি হইলে গোবিন্দের একবার তার সঙ্গে রসিকতা করা চাই-ই। সে যেই শুনিল পদবী গঙ্গোপাধ্যায়, অমনি পরম আত্মীয়ের মত তার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, "কি গো বিটলে বামুন, কেমন দেখছ শুনছ?"

চিরটা কালই গোবিন্দের রসিকতাগুলি একটু বেয়াড়া ধরণের, কিন্তু আজ তার দেওয়া 'বিটলে বামুন' নামটা আমাদের ভারী পছন্দ-সই হইয়া গেল। ব্যস্, সেই হইতে সবাই ছোকরাকে ডাকিতে স্বরু করিলাম—'বিটলে'। কিন্তু যাই বল, তিন অক্ষরের নাম ধরিয়া ডাকিতে মুখে বড় বিশেষ 'আয়েস' হয় না। কাজেই শীঘ্রই আমরা 'বিটলে' নাম ছাড়িয়া 'বিটু' ধরিলাম।

কিন্তু নাম যাই হোক্ না কেন, বিটু প্রথম দিনেই আমাদের তাক লাগাইয়া দিল পড়াশুনায়। ইংরাজী আর অঙ্কের ঘণ্টায় মাষ্টার মশাইরা তার উপর এতখানি খুসী হইয়া গেলেন যে আমাদের ফার্স্ট বয় তারকের মুখ তো একেবারে চুণ! অঙ্কের মাষ্টার মশাই তো যাইবার সময় স্পষ্টই বলিয়া গেলেন, "তারক হে, হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার!"

কিন্তু সংস্কৃতের ঘণ্টাতেই বিটুর জারীজুড়ী সব বাহির হইয়া গেল। পণ্ডিত মশাই মাঝে মাঝে প্রায়ই আমাদের শব্দরূপ লিখিতে দিতেন। আমরা খাতায় শব্দরূপ লিখিয়া তাঁর টেবিলের উপর রাখিয়া আসিতাম, তিনি সেগুলি শুদ্ধ

করিয়া এক একজনের খাতায় এক এক রকম মন্তব্য লিখিয়া দিতেন—কারো খাতায় 'উত্তম', কারো খাতায় 'নিকৃষ্ট' ইত্যাদি। সেদিনও এই রকমই হইল। খাতা ফেরৎ আসিলে সকলে উঁকি মারিয়া দেখি, বিটুর খাতাখানা পণ্ডিত মশাই কাটিয়া একেবারে লালে লাল করিয়া দিয়াছেন আর মন্তব্যে লিখিয়াছেন 'কুষ্মাণ্ড'! এতক্ষণ পরে এইবার তারকের মুখে হাসি ফিরিয়া আসিল।

তারকের সে হাসি কিন্তু বড় বেশী দিন টিঁকিল না। ক্লাসের মধ্যে এত দিন তার ছিল অখণ্ড প্রতাপ। পরীক্ষায় সে ফি বছর প্রথম হয়, সকলে তাকে অসম্ভব সমীহ করিয়া চলি। সে যে কত বড় একটা বিদ্যার জাহাজ তা আমরা টের পাইতাম টিফিনের সময়। নেপোলিয়নের খাটের উপর কয়খানা তোষক পাতা হইত, রণজিৎ সিংহ কোহিনূর মণিটাকে মাথায় না পরিয়া হাতে পরিতেন কেন, পদ্মা নদীর পোল তৈরীর সময় কোন্ কোম্পানী লোহা দিয়াছিল, কাঠই বা দিয়াছিল কোন্ কোম্পানী—এই সব রকমারী খবর দিয়া সে আমাদের একেবারে অভিভূত করিয়া দিত। তার কথাকে আমরা বরাবর বেদবাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু সেই বিশ্বাসে যেন বাধা পড়িতে সুরু হইল। সেদিন তারক রোজকার অভ্যাস মত তার বিদ্যার ঝুলিটা ঝাড়িতেছিল, আর আমরাও নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া গোগ্রাসে তাই গিলিতে-ছিলাম, হঠাৎ চাপা হাসির শব্দে চমকিয়া দেখি, বিটু একধারে মুখে কাপড় গুঁজিয়া প্রাণপণে হাসিতেছে আর মিট্‌মিট্ করিয়া আড়চোখে তারকের পানে তাকাইতেছে। তারককে বিদ্রূপ করা ছাড়া সে হাসির যে অন্য কোন অর্থই হইতে পারে না তা বোধ হয় সেভেন্থ্ ক্লাসের পুঁচ্‌কে রামপদ ছোঁড়াও বোঝে। তারক দস্তুর মত গম্ভীর হইয়া কহিল, "কি গো বিটু, হাস্‌ছ যে বড়?"

"বাঃ রে বাঃ, তুমি অমন করে হাসাবে, আর আমি হাস্‌ব না? ওই যে ইতিহাসের বড় লোকটার নাম কর্‌লে তার নাম ডায়নোসিরস্ নয়, ডায়নো-সিয়াস্। ডায়নোসিরস্ হচ্ছে একটা সেকেলে বিদ্‌ঘুটে কিম্ভূত কিমাকার জানোয়ার, ডায়নোসিয়াস্ ছিলেন একজন দারুণ নামজাদা রাজা, দুটো তো আর কিছু এক বস্তু নয়, অথচ তুমি তাদের বিলকুল এক বানিয়ে দিলে! তারপর, ম্যাজিনি (Mazzini) বলে তুমি যেটা এইমাত্র পড়্‌লে সেটার আসল উচ্চারণ হচ্ছে মাৎসিনি; আর এই যে তুমি বল্‌লে Mazzini একটা সহরের নাম, এটাও আর একটা ভুল; Mazzini সহর নয়, একজন স্বনামধন্য লোকের

নাম।" বলিয়া বিটু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আমরা সবিস্ময়ে তারকের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি সে মুখখানা রাগে একেবারে কালো হইয়া গেছে। তারকের উপর সব চাইতে বেশী চটা ছিল নিমাই, সেই দিন হইতে নিমাইয়ে আর বিটুতে একেবারে হরিহরাত্মা ভাব হইয়া গেল।

দিন দুই যাইতে না যাইতে বিটু ছোঁড়ার আরও অনেক গুণের কথা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেদিন নিমাই ক্লাসে আসিয়াই সংবাদ দিল বিটু নাকি বাঁশের নল দিয়া চমৎকার একরকম ফাউণ্টেন পেন তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে। গোবিন্দ তারকের চেলা, সে তো কথাটা শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির! "শোন কথা, বাঁশ কত মোটা জিনিষ, তা দিয়া কলম তৈরী করিলে সে কলমে কি দৈত্যেরা লিখিবে নাকি?"

তার ভুল অবশ্য আমরা তখনই ভাঙ্গিয়া দিলাম, কহিলাম, "আরে হাঁদা, আস্ত বাঁশ দিয়ে কি আর কেউ ফাউণ্টেন্ পেন্ তৈরী করে, ছোট বাঁশের কঞ্চির কথা হচ্ছে।"

কথাটা এবার গোবিন্দের মাথায় ঢুকিল বটে কিন্তু সে তাচ্ছিল্যের সাথে কহিয়া উঠিল, "ইঃ, তা আর হতে হচ্ছে না মশাই!"

কিন্তু নিমাই যখন কলমটা নিয়া মেকানিক্সের মাষ্টার মশাই শ্যাম বাবুর হাতে দিল, এবং শ্যাম বাবু যখন কাগজের উপর তর্ তর্ করিয়া নিজের নামটি লিখিয়া গেলেন তখন আমাদের আক্কেল তো গুড়ুম! সেদিন স্বীকার করিতেই হইল, নাঃ, বিটুর মাথায় শুধু কদম ফুলের শুঁয়ো নয়, বুদ্ধিও আছে প্রচুর।

আরও কিছুদিন গেল, হঠাৎ নিমাইয়ের আর একটা নতুন খবরে আমরা একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিলাম—বিটু নাকি আর একটা ভীষণ কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে! তাদের বাড়ীতে একটা পুরানো ঘড়ি ছিল, বিটু তার কলকব্জা-গুলি খুলিয়া তা দিয়া ছোট্ট একটি কলের নৌকা তৈরী করিয়াছে। চাবি দিয়া ছাড়িয়া দিলেই সেটা নাকি তর্ তর্ করিয়া জল কাটাইয়া চলিতে থাকে। বিটুদের পুকুরে নিমাই আজ স্বচক্ষে সেটাকে দেখিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু তারকেরও দিন আসিল। বলিতেছি।

সংস্কৃত ক্লাস আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিটু বরাবর তার পাততাড়ি গুটাইয়া একেবারে লাস্ট বেঞ্চে চলিয়া যাইত। লাইব্রেরী হইতে মোটা মোটা যে সব বিজ্ঞানের বই সে আনিত এটাই ছিল তার সেগুলি পড়িবার সময়।

সেদিনও এই রকমই ব্যাপার। হঠাৎ দেখি, পণ্ডিত মশাই পড়ান বন্ধ করিয়া একদৃষ্টে পেছনের বেঞ্চির পানে তাকাইয়া আছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আমরা সবাই সেদিকে তাকাইয়া দেখি মজার কাণ্ড বটে! বিটুর কোলের উপর একটা মোটা বই খোলা অবস্থায়, মাথা নীচু করিয়া সে সেই দিকে তাকাইয়া আছে এবং বোধ হয় অন্যমনস্ক ভাবেই হাত দু'খানা উপরে উঁচাইয়া ধরিয়াছে।

কিন্তু এর পরেই ঘটিল একটা তাজ্জব ব্যাপার। বিটু ঐ অবস্থাতেই দুই হাতে তালি লাগাইয়া বলিয়া উঠিল, "ফট্‌"।

এর পরে হাসি থামাইয়া রাখা যে কোন লোকের পক্ষেই অসম্ভব, আমরা হো হো করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলাম। বিটু অমনি ধড়্‌মড়্‌ করিয়া চমকাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত মশায়ের ধমক "অনভ্যান্‌·········!" বিটু তো লজ্জায় মারা যাইবার গতিক।

সেদিন বিকালেই আমরা খবর পাইলাম বিটু বানর ধরার এক কল তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে। পাড়ায় হনুমানের ভারী উৎপাত, অনেক দিন হইতেই সে কতকগুলি পুরানো কলকব্জা লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল, ফলে এই নতুন কলটির নাকি সন্ধান পাইয়াছে। সে কলে সামান্য একটু হাত পড়িলেই দু'ধার হইতে দু'টি অর্ধ বালা আসিয়া নাকি বানর ভায়ার হাতটিকে বন্দী করিয়া ফেলিবে। কি ভাবে সে বালা দুইটি দু'ধার হইতে আসিয়া যুড়িয়া যাইবে বিটু নাকি ক্লাসে তাই কল্পনা করিতেছিল, কখন অন্যমনস্ক ভাবে অমন বেয়াড়া রকমের 'ফট্‌' আওয়াজটা করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু বানর-ধরা কলই আবিষ্কার করুক আর যাই করুক ছেলে-মহলে সেই দিন হইতে বিটুর অবস্থা দস্তুর মত কাহিল হইয়া উঠিল। সে রাস্তা দিয়া যাইতেছে, পিছন হইতে হয়তো সকলে একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল—"ফট্‌"! ওঃ, সে কী বিভীষিকা! টিফিনের সময় হয়তো বা বেচারা একটু বাহিরে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখে তার রাফ্‌ খাতার উপর বড় বড় করিয়া কে লিখিয়া রাখিয়াছে—ফট্‌। কোন রসিক আবার এতেও সন্তুষ্ট নয়, গোটা বোর্ডখানা যুড়িয়াই সে হয়তো লিখিয়া রাখিল "ফট্‌,ফট্‌ ফট্‌ ফটাফট্‌!" কিন্তু রসিক-চূড়ামণি বলিতে হইবে আমাদের গোবিন্দকে, এক-দিন সে বিটুর কানের কাছে এক আড়াই-সেরি বাতাস ভরা কাগজের ঠোঙ্গা ফাটাইয়া দিল—ফট্‌।

ক্রমে 'ফটে'র অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিতে আরম্ভ করিল—আমাদের বিটু দমিয়া একবারে এতটুকু। ঘড়ির কাঁটা মিলাইয়া ঠিক দশটা উনত্রিশ মিনিটে সে ক্লাসে আসে আর চারিটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া উধাও হইয়া যায়। সারা টিফিনের সময়টা সে লাইব্রেরীর এক কোণে বসিয়া বসিয়া 'জিওলজির' বই পড়ে। কারো সাথে কথাবার্তা বলা সে এক রকম ছাড়িয়াই দিল, শুধু আমরা লক্ষ্য করিলাম, নিমাইয়ের সাথে বন্ধুত্ব তার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তারক, গোবিন্দ প্রভৃতিরও ভারী মন-মরা ভাব। ফুর্তির এত বড় একটা সুযোগ তারা পাইয়াছে, অথচ ছোঁড়ার জ্বালায় সেটাকে মোটে জমানই যাইতেছে না। এটা কি কম আফ্‌শোষের কথা?

কিন্তু গম্ভীরই হউক আর যাই হউক, আমার সাথে বিটুর কিন্তু বরাবরকার মত ভাব রহিয়াই গেল। আমাদের বাড়ী আর ওদের বাসা এক রকম লাগাও বলিলেই হয়, সর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ, গোমড়া-মুখ হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? এই তো ওদের বাড়ীর সবাই শিলং গিয়া মাস তিনেক থাকিবে, সে কথাটীও বিটু আমাকে জানাইয়াছে। বিটু অবশ্য যাইবে না, হাফ্‌ ইয়ার্লি পরীক্ষা একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এখন আর শিলং বেড়াইবার সময় কোথায়? সে আর তাদের রসুয়ে বামুন এখানেই থাকিবে।

শিলং যাওয়ার ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেলে সেদিন বিকাল বেলা বিটুর সাথে বাজারে দেখা হইল। তার সঙ্গে নিমাইও আছে। বিটু ফলপট্টিতে প্রচুর ফল কিনিতেছে—আম, কলা ইত্যাদি। একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি হে বিটু, এত ফল কি হবে? বাড়ীর সবাই তো শিলং চলে গেল!"

বিটু জবাব দিল, "বাঃ রে বাঃ, এ তিন মাস বুঝি তবে আমরা হাওয়া খেয়েই থাকব?" দেখিলাম তার ভারী তাড়াতাড়ি, নিমাইয়ের সাথে সে বাহির হইয়া গেল। আমার সঙ্গে ছিল অহিভূষণ, সে কহিল, "হবে না বাওয়া, খচ্চার পওহা হাতে এয়েছে যে, নিমাইয়ের তো এখন পোয়া বারো!"

রাত তখন প্রায় গোটা বারো। এক ঘুমের পর একটু মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়াছি, হঠাৎ হৈ চৈ শব্দ শুনিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিলাম। দেখি, পাড়ার ছেলেবুড়ো সব বিটুদের বাড়ীর দিকে ছুটিতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া

আমিও গিয়া সেখানেই জুটিলাম। বিটুদের বাড়ীতে উঠিতে প্রথমেই একটা বারান্দা,—প্রচুর কলার ছোবড়া, আধ-খাওয়া কলা, আমের আঁটি প্রভৃতিতে সেটি একেবারে ভরতি হইয়া গিয়াছে। ঠিক তার পরেই একটি অন্ধকার ঘর এবং সেই ঘরের ভিতর বেশ বড়সড় একটা বানর বসিয়া। শুনিলাম কলার কাঁদি সাবাড় করিয়া সে নাকি বিটুর তৈরী সেই কলে আট্‌কা পড়িয়াছে। ওঃ, এতগুলি কলা! বেচারা সবে আজ বিকালে সেগুলি কিনিয়াছিল!

ঘরের ভিতরে তখনও অন্ধকার, জানোয়ারটার শরীর ভাল করিয়া নজরে আসে না। শুধু দেখা যাইতেছে তার মাথাটা—বড় বড় ড্যাবডেবে চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সে ভীড়ের দিকে তাকাইয়া আছে। আমাদের পাড়ায় উৎপাত মুখপোড়া হনুমানগুলিরই বেশী। এটা কিন্তু অন্য জাতের, বাহিরের কোথা হইতে আসিয়াছে। লণ্ঠনটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বিটু কয়েক মিনিট দেখিল, শেষে কহিল, "কিছু করবার দরকার নেই এখন, থাক্ বেটা সারা রাত এমনি অবস্থায়। কাল সকালে খাঁচায় পুরে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। নতুন জাতের বানর, ওরা নিশ্চয়ই লুফে নেবে।"

কথাটায় সকলেই সায় দিলাম। জহুরীলাল ঝুনঝুনওয়ালা মাড়োয়ারী মহাজন, সে বলিল, "ওইটাই ঠিক কোথা আছে; কিছু রূপেয়া ভি ওরা পাঠিয়ে দেবে।"

বিটু কহিল, "যা বলেছেন মাড়োয়ারী বাবু, তাতে করে কলার দামটা যদি ওঠে। উঃ, কি ক্ষতিটাই না করেছে বলুন তো! ছেলেপেলে বাড়ী নেই, নষ্ট হবে না ভেবে এক কাঁদি কলা বাজার থেকে নিয়ে এলুম, আর হতভাগা দিলে সব তছ্‌নছ্ করে।"

বিটুদের রসুয়ে বামুন 'মিশির' এতক্ষণ চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কলার কথাটা আবার উঠিতেই বোধ হয় তার পুরানো শোক উথলিয়া উঠিল। সে তার হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা উচাইয়া কহিল, "ম্যঁায় আজ উস্‌কো খা লুঙ্গা।"

মিশিরের লাঠি পড়ে আর কি! বিটু হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া গেল। কিন্তু তার আগেই 'বানর' একেবারে পরিষ্কার মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল, "বাবা গো, গেলুম!" বানরের ডান হাত ছিল কলে আটকানো, কিন্তু বাঁ হাতটা খোলা ছিল। সেই খোলা হাতে সে মুখের উপর হইতে কি একটা

টানিয়া ফেলিল। আলো ফেলিয়া সবাই দেখিলাম, হরি! হরি! আমাদের গোবিন্দ যে!

* * * * *

পরদিন গোবিন্দকে আমরা সবাই ঘিরিয়া ধরিলাম, "হ্যাঁ রে, ব্যাপারটা কি বল্ তো? তুই ছোঁড়া একা একা মুখোস পরে কি করছিলি রে?"

গোবিন্দ বলিল, "বাঃ রে, একা হতে যাব কেন, তারকও তো সঙ্গে ছিল, হল্লা হতেই আমায় একা ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে পালাল। ব্যাপারটা কি জানিস, আমরা খবর পেয়েছিলাম বিটুর নাকি ভারী ভূতের ভয়। যাহাতক শোনা অমনি ঠিক হোলো বাছাধনকে একটু কাবু করতে হবে। কিন্তু ওই নিমাইটার তো আর অসাধ্য কিছু নেই, ওটা কি করে সব টের পেয়ে যায়! নন্দী ব্রাদার্সে বিটকেল বিটকেল কতগুলো মুখোস এনেছে জানতাম; তারই একটা কিনে মুখে পরা গেল, আর গায়ে জড়িয়ে নিলাম এক কালো কম্বল। কিন্তু ওরা গেছে আগে থেকে সাবধান হয়ে, পারব কেন বল্? দরজার গোড়ায় এমনি সেই বিদঘুটে কলটা পেতে রাখলে যে ছিট্‌কিনি খুলতে গেলেই হাত আটকে যায়। ব্যস্, গেলাম আটকে! বিটু তখন তাড়াতাড়ি সামনে এসে বললে, 'দাঁড়াও বাছাধন, ভূত সাজার মজাটা টের পাওয়াচ্ছি!' বলেই চীৎকার! ছোঁড়া বেঁটে হলে হবে কি, গলায় দারুণ জোর, এক মিনিট চেঁচিয়েই পাড়া জমিয়ে ফেল্লে।"

আমরা কহিলাম, "তা যেন হোল, কিন্তু তুই অতগুলি কলা খেলি কি বলে?"

"কে কলা খেল রে! ক্ষেপেছিস নাকি? ও তো বিটুরই কারসাজি। যেই দেখলে আমি আটকে পড়েছি, অমনি এক কাঁদি কলা এনে ছোবড়া ছাড়িয়ে বারান্দাময় ছড়িয়ে দিলে, যাতে লোকের মনে হয় আমিই কলা খেয়েছি। ছোঁড়ার পেটে পেটে কত বুদ্ধি! কিন্তু যাই বলিস ভাই, তারক ছোঁড়াকে এতদিনে চিনে নিলাম। উঃ, আমায় বিপদের মুখে ফেলে চোঁচা দৌড়!"

সেদিন গোবিন্দ ইস্কুল কামাই করিল। বেচারা আজ তিন বছর রেগুলার এটেণ্ডেন্সের প্রাইজ পাইয়া আসিতেছে, এবার সেটা গেল। ক্লাসে ঢুকিয়াই দেখিলাম বোর্ডের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ফট্'! হরফের ধাঁচ দেখিয়াই বুঝিলাম, এ নিমাইয়ের লেখা।

পুত্ররত্ন

নলহাটি গ্রামখানি গঙ্গার ঠিক উপরেই। এককালে গাঁ-খানায় শ্রী এবং শান্তি দুই-ই ছিল, আজকাল আশপাশে কতকগুলি চিনির আর পাটের কল হওয়ায় আগের মত নীরবতা আর নাই। তবে কল বসায় গ্রামের লোকদের যে কোন লাভই হয় নাই এমন কথাও বলা চলে না— অনেক গরীব লোক এইসব কলে চাকরী পাওয়ায় বেশ খাইয়া পরিয়া আছে।

বেলা তখন আটটা, নলহাটির জমিদার মুরলীধর বাবু বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়ুক গুড়ুক শব্দে গড়গড়া টানিতেছিলেন। তাঁর কপালে গভীর চিন্তার রেখা, মুখখানা বর্ষাকালের আকাশের মত অন্ধকার।

মিনিট পনেরো যাইতে-না-যাইতেই গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা একে একে মুরলী বাবুর বৈঠকখানায় জড় হইতে লাগিলেন। মুরলী বাবু তখন গড়-গড়ার নলটি ফরাসের উপর রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, "আরে প্রসন্ন, রাইচরণকে খবর দিয়েছিস্?"

"আজ্ঞে এই আমি এইছি"—বলিতে বলিতে স্বয়ং রাইচরণ আসিয়া মুরলী বাবুর পায়ের কাছে গড় করিল। সে এ গ্রামেরই লোক, মুরলী বাবুর প্রজা। অল্প বয়সে পাটের কলে ঢুকিয়া এখন সে একজন সর্দারস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিশ্রমের গুণে কলের সাহেবরাও তাকে খাতির করেন, আর বুদ্ধির দৌলতে গঙ্গার ধারে সে একখানা পাকাবাড়ী তুলিয়া মাসে মাসে ভাড়ার টাকা গণিতেছে।

মুরলী বাবু কহিলেন, "তোমরা সবাই থাকতে গাঁয়ে এ সব কি উপদ্রব স্বরু হ'ল রাইচরণ? পনেরো-কুড়ি বছরের ওপর হ'ল নলহাটিতে কল বসেছে—বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া—কোন্ দেশী লোক না আছে এখানে? কিন্তু একদিনের তরেও তো কই এতটুক উৎপাতের কথা

শোনা যায় নি। আর গেল মাস থেকে কি সব কাণ্ড ঘটছে বল তো? সেদিন শ্রীরাম চক্কোত্তির বাড়ী সিঁদ কেটে অতগুলো টাকার গয়না চুরি গেল। তার ক'দিন বাদেই দুপুর রাত্রে অঘোর সিঙ্গির বাড়ী হানা! সবার ওপর টেক্কা দিয়েছে কাল রাত্তিরে কুমোরপাড়ার ব্যাপার; একে বোধ করি ছোটখাটো ডাকাতিও বলা চলে। শুনেছ বোধ করি এতক্ষণে সব কথা?"

রাইচরণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে শুনিয়াছে। মুরলী বাবু আবার কহিলেন, "গাঁয়ে তো রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর বাস্তবিক, এতেও যদি আতঙ্ক না হয় তো হবে কিসে?"

রাইচরণ বলিল, "নিজের মুখে এখন কিছু বড়াই করতে চাই নে কত্তা, তবে এটাও ঠিক যে রাইচরণ মোড়ল বেঁচে থাকতে বাবাজীদের আর বেশী দিন ট্যাঁ-ফুঁ করতে হবে না। আমিও তাকে-তাকে রইছি।"

মুরলী বাবু একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাদেরই ওপর গাঁয়ের এখন যত কিছু ভরসা। আমার বয়স হয়েছে, আগের মত শক্তিসামর্থ্য তো নেই! পুত্রটি যে আমার একটি রত্ন, নইলে—"

ছেলে অসিতের উল্লেখ করিতে হইলে আজকাল মুরলী বাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, 'পুত্ররত্ন'। ম্যাট্রিকুলেশন এবং আই-এস-সি—দুই পরীক্ষাতেই অসিত উঁচু বৃত্তি পাইয়াছিল, আর বি. এস্-সিতে হইয়াছিল সর্বপ্রথম। এ হেন ছাত্র যখন দুই দুইবার এম-এস্-সিতে ফেল করিয়া বসিল তখন মুরলী বাবু দিশাহারা হইয়া গেলেন, কড়া চিঠি লিখিয়া অসিতকে বাড়ী আনাইলেন। বাড়ী ফিরিয়াই অসিত বাপের কাছে বায়না ধরিল তার একটি ল্যাবোরেটারী চাই—সে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবে। বাপ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "ওঃ, গবেষণা! তোমায় গবেষণা মানে তো গো এষণা—গরু খোঁজা। তা আর কষ্ট করে বাইরে গরু খুঁজতে হবে না, রোজ সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখানাই একবার করে দেখে নিও।" বাপের কাছে বিফল হইয়া অসিত মায়ের শরণ নিল, জানিত কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে পারিলেই এখানে কার্যসিদ্ধি। বাস্তবিক হইলও তাই; বর্তমানে অসিত তার ছোট্ট ল্যাবোরেটারীতেই সারাদিন আবদ্ধ থাকে। তার মস্তিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে পাড়ায় নানা রকমের গুজব রটিয়াছে। বন্ধ ঘরের মধ্যে লোকে নাকি তাকে নিজের মনে বিড় বিড় করিতে, উচ্চস্বরে হাসিতে, এমন কি কাঁদিতে পর্যন্ত শুনিয়াছে।

মুরলী বাবু সবে পুত্ররত্নের কথা পাড়িয়াছেন, এমন সময় চাকর প্রসন্ন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, "হুজুর, শীগ্‌গির একবার বাড়ীর ভিতরে এস্থন। মা ঠাক্‌রুণ মূর্চ্ছো গেছেন।"

উপস্থিত সকলেই প্রায় একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "সে কি রে ?"

"হেঁ কর্তা, বামী-ঝি ছুটে এসে বললে। মা ঠাক্‌রুণ দাদাবাবুর ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখলেন, তার পর এসেই পালঙ্কের ওপর শুয়ে পড়েছেন। তেনার দাঁত নেগে গেছেন।"

মুরলী বাবু কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে হন্তদন্ত হইয়া অন্দরের দিকে ছুটিলেন। আসিয়া দেখেন, দাসী-চাকরাণীর দল কর্ত্রী আনন্দময়ীর জ্ঞান ফিরাইয়া আনিয়াছে ; তিনি চোখে আঁচল দিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছেন।

কর্তা ব্যাপারটা মনে মনে আঁচিয়াছিলেন, কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে অসিতের ল্যাবোরেটারীর খোলা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যে দৃশ্য দেখিলেন তা তাঁর কল্পনারও বাহিরে। অসিত বাঁ হাতে তার পোষা কুকুর-ছানা টেবীর বকলস্‌টি ধরিয়া ডান হাতে একটা পেন্সিলের সাহায্যে ক্রমাগত তার পেটে খোঁচাইতেছে, আর সেই অসহায় জীব ঊর্ধ্বমুখ হইয়া বোধ করি আকাশস্থ দেবতাদের কাছেই ঘোরতর প্রতিবাদ জানাইতেছে। অশরীরী জীব-বিশেষের মত নাকি স্বরে অসিত তাকে সান্ত্বনা দিতেছে, "বাঁঃ রে টেবিঁ, বাঁঃ। আঁর একটুঁ—আঁর একটুঁ ; তোঁকে আজ মাংস খাঁওয়াবোঁ—পাঁঠার নাড়িঁ ভুঁড়ি—কঁচিঁ পাঁঠাঁ !"

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মুরলীধর বাবু আজ ঘুমাইলেন না, ঘুমাইবার মত তাঁর অবস্থা ছিল না। দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল, চাকরের উদ্দেশ্যে তিনি হাঁক দিলেন, "আরে প্রসন্ন তামাক দিয়ে যা। আর দেখ, তোদের দাদাবাবুকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি।"

চাকর তামাক দিয়া গেল এবং তার একটু পরেই অসিত আসিয়া বাপের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুরলী বাবু পুত্রের আগমন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ইঙ্গিতে তাকে ফরাসের উপরে বসিতে বলিয়া আরও মিনিট দুই নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "সোনার-গাঁয়ে বোসেদের বাড়ী আজ বিয়ের নেমন্তন্ন আছে, শুনেছ ?"

মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া অসিত কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ রাত্তিরে আপনি সেখানে যাবেন শুনেছি।"

মুরলী বাবু বলিলেন, "শেষ খবর তা হলে এখনও পাও নি দেখছি। নেমন্তন্ন রাখতে আমি যাব না, যাবে তুমি। সন্ধ্যার পর ড্রাইভারকে হাজির থাকতে বলে দাও গে।"

অসিতের মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল, সে কহিল, "আজ রাত্রে? আজ রাত্রে আমি তো কোথাও যেতে পারছি নে বাবা! আমার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট।"

"চুলোয় যাক্ তোমার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট!"—মুরলী বাবু বাধা দিয়া উঠিলেন, "তোমায় যা করতে বললাম, করো গে।"

সন্ধ্যার পর বিরসবদনে আসিত নিমন্ত্রণ রাখিতে সোনার-গাঁ রওনা হইল। আর তার একটু পরেই প্রসন্নকে সঙ্গে নিয়া কর্তা ঢুকিলেন তার ল্যাবোরে-টারীতে। বাড়ীর এক কোণে অসিতের ল্যাবোরেটারী—নানা বৈজ্ঞানিক দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ। মুরলী বাবু হাতের কাছে যে যে জিনিস পাইলেন চূর্ণ করিলেন, বাকীগুলি জানালা দিয়া দূরে একটা ঝোপের আড়ালে ফেলিয়া দিতে দিতে মনে মনে বলিলেন, "পাগলামি তোমার ছুটোচ্ছি—দাঁড়াও না!"

রাত্রি দশটার পর বাড়ী ফিরিয়া অসিত যখন সমস্ত ব্যাপারটা টের পাইল তখন সে এমনই আর্তনাদ আরম্ভ করিল যে আনন্দময়ী তো আনন্দময়ী, মুরলী বাবু পর্যন্ত থতমত খাইয়া গেলেন। পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে সে ঝোপের নিকট হইতে মুরলী বাবুর ফেলা সমস্ত জিনিষপত্র কুড়াইয়া আনিল; তারপর ল্যাবোরেটারীর দরজায় খিল আঁটিতে আঁটিতে উচ্চকণ্ঠে বার বার সকলকে জানাইয়া রাখিল, যদি সে রাত্রে কেউ তার ঘরের ত্রিসীমানায়ও পদার্পণ করে তো কাল সকালে উঠিয়া এ গ্রামে আর কেউ তাকে দেখিতে পাইবে না।

আধ ঘণ্টাটাক বাদে খট্ করিয়া ল্যাবোরেটারীর দরজায় একটু শব্দ হইল—অসিত বাহিরে আসিতেছে। কি জানি উন্মাদ কি কাণ্ড করিয়া বসে, এই ভয়ে বাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্ন মনে জাগিয়া ছিল। আনন্দময়ী ঠাকুরের কাছে 'সঙ্কটা ব্রতের' সঙ্কল্প জানাইয়া সবে সেই মাত্র দাওয়ার উপর একটু বসিয়াছেন, ধীরে ধীরে অসিত তাঁর কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "বাবা আজ রাইচরণকে কলকাতা পাঠিয়েছেন, সত্যি?"

"হ্যাঁ বাবা, বিকেল পাঁচটার গাড়ীতেই রাইচরণ রওনা হয়ে গেছে তো!"

অসিত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরবে কবে?"

"কাল সকালের ট্রেনে। আজকে তো আর ফেরার গাড়ী পাবে না!"

কেবল অন্ধকার ছিল বলিয়াই আনন্দময়ী দেখিলেন না, এ খবরে অসিতের মুখ অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একঘণ্টা আগেকার সমস্ত দুঃখ-গ্লানি তার তখন ধুইয়া মুছিয়া গেছে।

পর দিন প্রাতে উঠিয়াই সমস্ত নলহাটি গ্রাম স্তম্ভিত, অভিভূত হইয়া পড়িল—গত রাত্রে কালীবাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া দেবীর হাজার টাকা মূল্যের সোনার গহনা কে সরাইয়াছে। গ্রামবাসীরা যতই নিরীহ-নির্বিবাদী হোক না কেন, সকলেরই সহ্যের একটা সীমা আছে; সে সীমা এবার ছাড়াইয়া গেল। সে দিনই মধ্যাহ্নে মুরলী বাবু গ্রামের জনা চারি মাতব্বর ব্যক্তিকে মহকুমায় পাঠাইয়া দিলেন—সমস্ত ব্যাপার হাকিমের (এস্. ডি. ও'র) গোচর করিয়া তাঁকে তাঁরা ব্যাপারটার একটা কিনারা করিতে অনুরোধ করিবেন। নহিলে নলহাটি বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। মুরলী বাবুর বোধ হয় ইচ্ছা ছিল এই সঙ্গে অসিতকেও পাঠান, কিন্তু যাত্রার সময় বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না।

তারই ঠিক পর দিনকার ঘটনা। বিকাল বেলায় খবর রটিল এস্. ডি. ও নাকি স্বয়ং নলহাটিতে আসিয়াছেন এবং থানায় উঠিয়া গ্রামের অত্যাচার-অনাচার সম্বন্ধে নানা রকম খোঁজ লইতেছেন। শুনিয়াই গ্রামের গণ্যমান্যেরা তাড়াতাড়ি থানায় আসিয়া জুটিলেন—আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা সুরু হইল। হঠাৎ সেই সময় এমন একটা কাণ্ড ঘটিলে যা কেউ কখনো আশা করে নাই—একটা চামড়ার সুটকেস হাতে অসিত আসিয়া সেখানে হাজির।

সোজা এস্. ডি. ও'র সামনে আসিয়া অসিত বলিল, "আপনি এ গাঁয়ের চুরি সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিতে এসেছেন শুনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। বোধ করি এ বিষয়ে আমি আপনাকে অনেকটা সাহায্য করতে পারবো।"

উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি এস্. ডি. ও'র কানের কাছে মুখ নিয়া বলিল, "ছেলেটির মাথায় কিন্তু একটু দোষ আছে।" এস্. ডি. ও. অসিতের পা হইতে মাথা পর্যন্ত একবার দেখিয়া নিলেন, তার পর বলিলেন, "কি ভাবে আপনি সাহায্য করতে চান? আপনার ও সুটকেসটাতে কি? একেবারে চোরাই মাল শুদ্ধ উদ্ধার করে এনেছেন নাকি?"

একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। অসিত কিন্তু এতটুকু অপ্রস্তুত হইল না, বলিল, "প্রায় তাই-ই।" তার পর দারোগার দিকে ফিরিয়া কহিল,

"অনাথ বাবু, ঘরের এ পাশটা একটু পর্দার আড়াল করিয়ে দিতে পারেন ?"

এই অদ্ভুত প্রস্তাবে অনাথ বাবু বিস্মিত হইলেন যথেষ্টই, কিন্তু তবু তিনি জনা দুই কনেস্টবলকে হুকুম দিয়া অসিতের কথামত পর্দা খাটাইয়া দিলেন। সকলের বিস্ময় আরও চড়াইয়া দিয়া অসিত সেই পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইল।

একটু পরেই যে কাণ্ড ঘটিল তাকে 'আশ্চর্য' বলিলেও নিতান্তই কম বলা হয়, অন্ত কোন বিশেষণের দরকার—পর্দার ওপাশ হইতে বহু লোকের গলার সুস্পষ্ট আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে ! সেখানে ঠিক নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্তা হইতেছে, শোনা গেল :—

"...তার পর সর্দার, কালীবাড়ীর গহনাগুলো তো গাপ্ করে গেল, এবার মুরলী বাবুর বাড়ী লুট হচ্ছে কবে ? আঃ, ব্যাটার ছাঁৎলা-পরা টাকা, হাত আমার নিস্পিস্ করছে।"

"আস্ছে অমাবস্যার রাত্তিরে। কিন্তু খুব হুঁসিয়ারির সঙ্গে চলতে হবে হে ! কাল নাকি হাকিমের কাছে খবর গেছে। হাকিম বোধ করি শীগ্গিরই এ গাঁয়ে এসে পড়বে—তার আগেই গহনা-পত্তরগুলো সরিয়ে ফেলা চাই ; নেবুবাগানের মাটির নীচে বেশী দিন ওভাবে ওগুলোকে রাখা চলবে না··· ।"

উপস্থিত সকলে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন—এ কি, এ যে রাইচরণের গলার স্বর ! অনাথ বাবু গিয়া বিদ্যুদ্বেগে পর্দার কাপড়টা সরাইয়া দিলেন ; তার পরেই কিন্তু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন, ঘরে তো অসিত ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই ! কে এই ভৌতিক রহস্যের মীমাংসা করিবে ?

অসিত একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "দিনে দুপুরে অমন ভয় পাবেন না অনাথ বাবু ! এই মাত্র যা শুনলেন সেটা ভূতের গলার আওয়াজ নয়, আওয়াজটা বেরোচ্ছে আমারই এই খোলা সুটকেসটির ভেতর থেকে। আপনারা সব সুস্থ হ'য়ে নিজের নিজের জায়গায় বসুন, আমি এক্ষুণি রহস্যের দ্বার-উদ্ঘাটন করছি।"

স্বপ্নাবিষ্টের মত সকলেই বসিয়া পড়িলেন, অসিত বলিতে আরম্ভ করিল :

"বছর কয়েক আগে ফিজিক্স্ নিয়ে যখন আমি এম্.এস্-সি ক্লাসে ভর্তি হলাম তখন থেকেই পড়াশুনার চাইতে আবিষ্কারের নেশাই আমায় পেয়ে বসল বেশী। চব্বিশ ঘণ্টাই নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে ল্যাবোরেটারীতে

পড়ে থাক্‌তাম—'শব্দ' সম্বন্ধে কতকগুলো নতুন জিনিষ বার করব এই আমার মৎলব। একদিন মনে হ'ল, এডিসন্ গ্রামোফোন আবিষ্কার করে জগতের অনেক উপকার করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনো তাতে কতগুলি দোষ-ত্রুটী রয়ে গেছে। গ্রামোফোন শুন্‌লে আওয়াজটা যে একটা কল থেকেই বেরোচ্ছে, কোন স্বাভাবিক মানুষের গলা নয়, তা বোধ করি নিতান্ত ছোট ছেলেরাও বুঝতে পারে। মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা, কল থেকে অবিকল মানুষের গলার আওয়াজ বার করা কি একেবারেই অসম্ভব? এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে নানা রকমের কলকব্জা নিয়ে আমায় প্রচুর মেহনৎ করতে হল। মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, এমনিধারা একটা যন্ত্র আমায় তৈরী করতে হবে, যে, শুধু স্বাভাবিক আওয়াজ নয়, তার আশপাশে সামান্য—অতি তুচ্ছ একটু শব্দ হলেও যাতে সেটা সে যন্ত্রে ধরা পড়ে। এ কাজে হাত দিয়ে সেই সঙ্গে এম্. এস্-সি পাশের পড়া তৈরী আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না, পর পর দু' বচ্ছর তাই পরীক্ষায় ফেল হলাম। বাবা গেলেন চটে, অকর্মণ্য মনে করে পড়া ছাড়িয়ে দিলেন। গাঁয়ে ফিরেও কিন্তু আমি আমার কাজ ছাড়ি নি, মার কাছ থেকে কিছু টাকা জোগাড় করে বাড়ীতেই ছোটখাটো একটা ল্যাবোরেটারী বসিয়ে নিয়েছি। নানা রকম আওয়াজের বিভিন্ন পর্দা যাতে হুবহু সেই ভাবেই কল থেকে বেরিয়ে আসে তারই জন্যে যন্ত্রের সুমুখে বসে সময় সময় অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ আমায় করতে হয়েছে—কখনো হাসি, কখনো নাকি সুর, কখনো বা জিনিষপত্র নিয়ে ঠোকাঠুকি। পোষা জানোয়ার এনে তাদের ডাক পর্যন্ত আমি আমার যন্ত্রে ধরতে চেষ্টা করেছি। একটা লোকের আসল উদ্দেশ্য যদি না জানা থাকে, আর তাকে যদি অনবরত বন্ধ ঘরে এই অবস্থায় দেখা যায় তবে তার সম্বন্ধে পাগল অপবাদ রটা কিছুই বিচিত্র নয়। বোধ করি গাঁয়ের কারো কারো, এবং বিশেষ করে আমার মা-বাবার এমনই একটা ধারণা হয়ে থাকবে। পরশু সন্ধ্যের পর নেমন্তন্নের ছুতোয় আমায় অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে বাবা আমার ল্যাবোরেটারী তছ্‌নছ্ করে ফেল্লেন, যন্ত্রপাতি বাইরে ফেলে দিলেন। বোধ হয় তিনি ভেবেছিলেন দিন কতক বাতিক বন্ধ রাখলে পাগলামি আপনা হতেই সেরে যাবে।

"বাড়ী ফেরার পর আমার যে কি রকম মনোভঙ্গ হ'ল তা আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না, কেম-না সে দিন সকালেই আমি টের পেয়েছি যে আমার এক্স্‌পেরিমেণ্ট্ সফল হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি, ঈশ্বর যা

করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। বাবা যে ঝোপের ভেতর যন্ত্রটা ফেলেছিলেন সেখান থেকে সেটা তুলে এনে, ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে, যন্ত্রে কি ধরা পড়ে গেছে শুন্‌লাম? রাইচরণের গলার আওয়াজ! খাটো গলায় সে তার সঙ্গীর সঙ্গে যে কথা কইছিল, তার ধরণটা আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ল না। তা ছাড়া বিস্ময়েরও একটু কারণ ছিল—সন্ধ্যেবেলা ড্রাইভারের মুখে শুনেছিলাম বাবা নাকি সেদিন বিকেলে রাইচরণকে কি কাজে কল্‌কাতা পাঠিয়েছেন। বিকেলে যে লোক কল্‌কাতা রওনা হয়ে গেছে সন্ধ্যের পর বাইরে-ফেলা যন্ত্রে তার গলার স্বর ধরা পড়্‌ল কি করে? সে আর কিছু সে রাতেই গাঁয়ে ফিরতে পারে নি।

"মা'র কাছে গিয়ে সামান্য একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে এল—অর্থাৎ রাইচরণ গাঁয়েই রয়েছে অথচ লোকের মনে ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে যে সে গেছে কল্‌কাতায়।

"ভোরে উঠেই শুনলাম মা কালীর গায়ের সমস্ত গহনা কাল রাত্তিরে খোয়া গেছে। মনে আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল, এখন সেটা আরও দৃঢ় হ'ল—আমাদের গাঁয়ের এই হঠাৎ-আসা দস্যুদলের নেতা রাইচরণ নয় তো? গঙ্গার ধারে ওর ওই ভাড়া-খাটানো বাড়ীটা ওদেরই রাত্তির বেলাকার আড্ডা নয় তো? পরখ্‌ করতে হচ্ছে ব্যাপারটা আজকেই। গাঁয়ে যেমন হৈচৈ পড়ে গেছে তাতে আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তবে আজ রাত্তিরে ওখানে রাইচরণদের একটা সলা-পরামর্শের বৈঠক বস্‌বেই। দুপুর বেলা সমস্ত 'ভাড়াটেই' কলের কাজে বেরিয়ে যায়, সেই সময় কোন মতে যদি আমার যন্ত্রটাকে ওদের বস্‌বার বড় ঘরটায় কোথাও লুকিয়ে রেখে আসতে পারি তবে রাত্তিরে কি আলোচনা ওদের হয় না হয় সমস্তই টের পাওয়া যাবে।

চাদরের নীচে ছোট্ট যন্ত্রটি ঢেকে দুপুর বেলা তাই বেরিয়ে পড়া গেল। দেখলাম বাড়ী পাহারায় একজন লোক ওদের মোতায়েন আছে বটে, কিন্তু তার চোখে আমি আধ-পাগ্‌লা বই আর কিছুই নই। বিশেষ করে সব কথা বল্‌বার আর দরকার নেই, শুধু এইটুকু শুনে রাখুন, লোকটাকে ধাপ্পা দিয়ে আমার মনোমত জায়গায় যন্ত্রটিকে বসিয়ে রেখে আস্‌তে খুব বেশী বেগ আমায় পেতে হয়নি। তার পর আজ দুপুরে গিয়ে আবার ঠিক ওই ভাবেই সেটাকে বার করে এনেছি। কাল রাত্রে রাইচরণের বৈঠকে কি

ধরণের আলাপ চলছিল তা তো একটু আগে আমার যন্ত্রই আপনাদের বলে দিয়েছে।”

অসিতের কথা শেষ হইল, সকলে তখন বিস্মিত, স্তম্ভিত, নির্বাক্। তার পরেই এস্. ডি. ও উঠিয়া আসিয়া দুই হাতে অসিতের ডান হাতখানা সাগ্রহে চাপিয়া ধরিলেন, ইংরাজীতে বলিলেন, “ইয়ং ম্যান্, আই কনগ্র্যাচুলেট ইউ।” (যুবক, আমি তোমায় অভিনন্দিত কর্‌ছি।)

মা কালীর সমস্ত গহনাই ফেরৎ পাওয়া গেল, অবশ্য সেগুলির বদলে অনাথ বাবুও রাইচরণকে একখানা গহনা পরাইয়া দিলেন। চলতি কথায় সেখানাকে বলে হাত-কড়ি। মুরলী বাবু অসিতকে প্রকাণ্ড ল্যাবোরেটারী বানাইয়া দিয়াছেন। কথায় কথায় এখন আর তিনি ‘পুত্ররত্ন’ বলেন না, তবে আনন্দময়ী মাঝে মাঝে তাঁর ‘গঙ্গাজল’দের বলেন বটে, “আহা, আমার ছেলে তো নয়—একটি রত্ন!”

কিছুদিন বাদেই রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটে, তাই বলছিলাম—এপ্রিলের মাঝামাঝি।"

অধ্যাপক নিজের মনে কি একটু ভাবিলেন, তারপর কহিলেন, "আচ্ছা, জগদিন্দ্র, আমাকেই ওর দুর্দশার মূল ভেবে নিয়ে অবিনাশ আমায় একটু শিক্ষা দিতে চাইবে—একথা মনে ভাবা কি খুব অস্বাভাবিক ?"

জগদিন্দ্রনাথ ডক্টর আচার্যের মুখের দিকে তাকাইল। "মরা মানুষ আপনাকে শিক্ষা দেবে ? সে কি স্যর ! ভূত হয়ে, নাকি শয়তানের চেলা হয়ে ?"

কথাগুলি প্রোফেসার আচার্যের কানে গেল বলিয়া বোধ হইল না—আবার যেন তিনি স্বপ্নলোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। খানিক পরে একটা জোর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি কহিলেন, "স্যর জ্ঞানশঙ্কর ঘোষের গার্ডেন-পার্টিতে তুমি নিশ্চয়ই যাচ্ছ জগদিন্দ্র! আমার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে বল যে বিশেষ কোন কারণে তাঁর নেমন্তন্ন রক্ষা করা আমার পক্ষে কিছুতেই আজ সম্ভব হল না। আর দেখ, নীচে যাবার বেলা ড্রাইভারকে গাড়ীটা বার করতে বলে যেও, আমি এক্ষুনি একটু বেরুব।"

সন্ধ্যার কিছু পরে ডক্টর আচার্য যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁকে যেন আর চেনা যায় না। এই শান্ত, সৌম্য, জ্ঞান-গম্ভীর বৃদ্ধকে জীবনে বিচলিত হইতে খুব কমই দেখা গিয়াছে, কিন্তু আজ তাঁর প্রত্যেকটি কাজই যেন স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। ল্যাবোরেটারীতে ঢুকিয়াই প্রথমে তিনি একখানা বড় ব্ল্যাক্‌বোর্ড টানিয়া বাহির করিলেন, তারপর তার উপর খুব বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে ইংরাজীতে লিখিলেন ABINASH ; লেখার নীচে একটা গোলাকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকিলেন, তার মধ্যে কতগুলি গাছের পাতা আছে, বোঝা গেল। সব শেষে রহিল নিজের নামের আদ্যক্ষর H. A. অর্থাৎ হৃষীকেশ আচার্য।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবোরেটারীর ছাদের উপর মিস্ত্রির সাহায্যে বাঁশের সঙ্গে ব্ল্যাক্‌বোর্ডখানা দু'পাশে দু'খানি সাদা কাগজের নিশানসহ টাঙাইয়া দেওয়া হইল।

এই অভাবনীয় ব্যাপারে শুধু জগদিন্দ্রনাথ নয়, ল্যাবোরেটারীর প্রত্যেকটি প্রাণীই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িল। জীবনসন্ধ্যায় সেই জ্ঞানবৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের এ কি ব্যবহার ?

বেলা কিছু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কাতারে কাতারে লোক দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া গড়ের মাঠের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

শেষরাত্রের দিকে একখানা অদ্ভুত এরোপ্লেন ইডেন গার্ডেনের ভিতর নামিয়াছিল। তার পর এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইডেন গার্ডেন যেন এক শ্মশানে পরিণত হইবার জো হইয়াছে। সেখানকার সমস্ত ফুলের বাগান নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, আর তা ছাড়া ছোট-বড় বহু গাছও কে যেন ভাঙ্গিয়া নছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়াছে। ভোর হওয়ার পর এ দৃশ্য জানা দুই পুলিশ সার্জেণ্টের চোখে পড়ে। তারা তোড়জোড় করিয়া ছুটিয়া যাইতেই এরোপ্লেনখানা কোন রকম আড়ম্বর না করিয়াই অবলীলাক্রমেই যেন হাইকোর্টের ছাদের উপর গিয়া বসে। তার পর সেখান হইতে মনুমেণ্টের চুড়ার উপর উড়িয়া আসিয়াছে। টিকটিকি যে ভাবে দেওয়ালের গা বাহিয়া ওঠে, এই অতি আশ্চর্য এরোপ্লেনখানিও মনুমেণ্টের চুড়ায় ওঠার সময় নাকি অবিকল সেই ভাবে উঠিয়াছিল।

লালবাজার পুলিশ-অফিসে ইতিপূর্বেই খবর গিয়া পৌঁছিয়াছিল, দলে দলে লাল পাগ্‌ড়ী, সার্জেণ্ট, অফিসার প্রভৃতি ময়দানে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। একজন অফিসার খানিকটা অগ্রসর হইয়া এরোপ্লেনখানাকে বার বার নামিতে ইঙ্গিত করিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল অধ্যাপক ডক্টর হৃষীকেশ আচার্য ঊর্ধ্বশ্বাসে সকলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই অবাক্ হইয়া গেল, কেননা সকলেই জানিতে তিনি সর্বদা তাঁর ল্যাবোরেটারীর মধ্যেই নিজের সাধনায় মগ্ন আছেন, বাহিরের শত কৌতূহলও তাঁর মনের কোণে একটুকু আঁচড় কাটিতে পারে না।

কিন্তু এর পরেই যে দৃশ্য সকলে দেখিল তা বুঝি আরও বিস্ময়কর। এরোপ্লেনখানা এতক্ষণ মনুমেণ্টের উপর নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল, ডক্টর আচার্য আসামাত্র এক ঝলক তীব্র আলো কেবল তাঁরই একার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তার পরই সেখানা নিঃশব্দে উড়িয়া মুহূর্তে বহু দূরে মিলাইয়া গেল।

পর দিন কলিকাতার ছোট বড় প্রায় সমস্ত খবরের কাগজগুলিতেই দু'

কলম জুড়িয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হরফে নিম্নলিখিত ধরণের হেডিং বাহির হইল—

শয়তানের এরোপ্লেন

কলিকাতায় আজব কাণ্ড!

চব্বিশ পরগণা ও হাওড়া জেলায় বহু স্থানে নির্মম ধ্বংস-লীলা!

গতকল্যকার আজব কাণ্ডের একটা বিশদ বিবরণ দিয়া খবরের কাগজ লিখিতেছে—

"এই অদ্ভুত এরোপ্লেন এবং তার অদৃশ্য আরোহী গভীর রহস্য-জালে আবৃত। এই আরোহীর কী যে অভিসন্ধি তাও আজ পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছেই অজ্ঞাত। তবে কোন একটা অজানা উদ্দেশ্য লইয়া সে যে প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে সেটা বোঝা যাইতেছে। তার এই উৎপাতে চব্বিশ পরগণা ও হাওড়া জেলার বহু চাষীর মনে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। যেরূপ অবিশ্বাস্য রকমের অল্প সময়ের মধ্যে অপূর্ব ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ক্ষেত হইতে সে শস্য উঠাইয়া লইতেছে। নরহত্যায়ও এ শয়তানের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। একটি ক্ষেতের মধ্যে এক কৃষকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে—তার বুকের পাঁজরগুলি একেবারে চূর্ণ বচূর্ণ।..."

ডক্টর আচার্য খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেছিলেন, তাঁর মুখ তখন পাণ্ডুর, বিবর্ণ। হঠাৎ তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "শাসনের বাইরে চলে গেছে—নিজের খুসীমত যা ইচ্ছে তাই করতে সুরু করে দিয়েছে।"

সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল জগদিন্দ্রনাথ, সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ডক্টর আচার্য সমস্ত ঘরময় অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তার পর হঠাৎ এক সময় থামিয়া, জগদিন্দ্রনাথের হাত দু'টি ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবা জগদিন্দ্র, অবিনাশকে রক্ষা করতেই হবে—যে করেই হোক্ তাকে বাঁচাতেই হবে।"

এইবার জগদিন্দ্রনাথ প্রোফেসার আচার্যের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইল। তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি

কি বল্‌ছেন স্যর! অবিনাশকে বাঁচাব কি? সে যে আজ ছ' বছরের ওপর হ'ল মারা গেছে!"

"না, মারা যায় নি। আমাদের সকলের ধারণাই ভুল।"—দৃঢ়স্বরে ডক্টর আচার্য কহিলেন।—"রেলওয়ে অ্যাক্‌সিডেন্টটা কি মাসে ঘটেছিল তোমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে কাল অত তাড়াতাড়ি মোটরে আমি কোথায় বেরিয়ে পড়্‌লাম তুমি মনে কর? 'পত্রিকা'-অফিসে। সেখানে পৌছেই ১৯২১ সনের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় হপ্তার সবগুলি কাগজ দেখতে চাইলাম। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ১৩ তারিখের কাগজেই অ্যাক্‌সিডেন্টের কথা রয়েছে দেখ্‌তে পেলাম। সেই অ্যাক্‌সিডেন্টে যারা যারা মারা পড়েছিল তাদের নাম-ধামও ওদিনকার কাগজেই পাওয়া গেল। লিস্টের ভেতর একটা নাম দেখলাম অবিনাশ রায়, ব্র্যাকেটের ভেতর ডক্টর হৃষীকেশ আচার্যের সহকারী। তার পর ১৭ তারিখের কাগজ উল্টে দেখি, রেলওয়ে কোম্পানী মৃত ব্যক্তিদের একটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে—ছোট ছোট হরফে সেটা ছাপা। অবিনাশ রায় সম্বন্ধে তাতে লিখেছে—বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, গায়ের রং কালো, মাথায় টাক আছে। অথচ অবিনাশের বয়স তখন সবে আটাশ বছর; তার ওপর সে দিব্যি গৌরবর্ণ, আর মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কাজেই এর থেকে বুঝ্‌লাম ও গাড়ীখানায় নিশ্চয়ই অবিনাশের পরিচিত কোন লোক চেপেছিল, আর তার পকেটে ছিল অবিনাশেরই নামের কার্ড অথবা তার কাছে অপরের লেখা কোন চিঠি। অ্যাক্‌সিডেন্টে সেই লোকটাই মারা গেছে, আর তার পকেটের কাগজপত্র পরীক্ষা করে রেলওয়ে কোম্পানী মনে করেছে তার নাম অবিনাশ রায়।"

জগদিন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু অবিনাশ-এর প্রতিবাদ করলে না কেন?"

"আমাদের চোখের আড়ালে থাকতে চাইছিল বলে। বাস্তবিক, বাইরে আমরা নিজেদেরকে বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক বলে পরিচয় দিই, আসলে কিন্তু বিজ্ঞানের ওপর আমাদের একটুকু আস্থা নেই। নতুন একটা কিছু শুনলেই সেটাকে আমরা নিছক পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতেই চিরটা কাল অভ্যস্ত। নইলে, অবিনাশ যখন আমারই ল্যাবোরেটারীতে বসে অত বড় একটা আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখছিল, তখন আমি অনায়াসে তাকে 'পাগল'

অপবাদ দিয়ে এখান থেকে বিদায় করে দিলাম। অবশ্য ওরই মঙ্গলের জন্যে আমি এ কঠোর ব্যবহার করেছিলাম।...

"তার পর এই ছ' বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অবিনাশ যে অপূর্ব, অভাবনীয় আবিষ্কার করেছে তাতে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে—বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে ওর নাম লেখা থাকবার কথা!...

"কিন্তু সবই বুঝি বিফলে গেল জগদিন্দ্র! ওর 'সৃষ্টি'কে ও বুঝি আর বাগে আনতে পারছে না—সে বুঝি বেঁকে বসেছে!"

"কার কথা বলছেন আপনি?"

"ওই ফড়িংটার।"

"অ্যাঁ, অ্যাঁ, কি বলছেন?"

"বলছি, খবরের কাগজগুলো যে 'শয়তানের এরোপ্লেন', বলে মিথ্যেমিথ্যি চীৎকার করে মরছে, আসলে ও জিনিষটা কি? অবিনাশেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল—একটা বিশাল, অতিকায় ফড়িং। ফড়িং অতিকায় হলে যে ঠিক এরোপ্লেনের মতই দেখতে হবে তা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে—শুধু নীচের ডানাখানা নেই! ইদানীং ফড়িংই ছিল ওর গবেষণার বিষয়; ফড়িংএর ছোট্ট শরীরের ভেতর কি কি কোষ আছে তাই নিয়ে সে পরীক্ষা করছিল। কত দিন কত রকমের আলো সে যে ফেলেছে নিশ্চয়ই তা তুমি ভুলে যাওনি। একদিন সে আমায় বল্লে, 'ফড়িংয়ের আকার চেষ্টা করলে বোধ করি বড় করে তোলা চলে।' নিছক ছেলেমানুষি বলে কথাটাকে আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। তারপর কিছুদিন বাদে অবিনাশ আবার একদিন বললে, 'মানুষ এরোপ্লেন-জেপেলিন চালাতে কত অজস্র টাকা বৃষ্টি করছে। সেগুলির জন্যে এরোড্রোম চাই, ভাল পাইলট চাই—কত কিছুর প্রয়োজন। অথচ এ সত্ত্বেও বিপদের অন্ত নেই—আজ গাছের ওপর পড়ছে, কাল আগুন ধরে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের যদি ছোট ফড়িংটিকে ক্রমে ক্রমে বড় করে শেষটায় এরোপ্লেন বা তার চাইতেও বড় আকার দেওয়া যায়, তবে মানুষের নানান দিক থেকেই সুবিধে। হাতীকে যেমন পোষ মানিয়ে মাহুত কেবল মাত্র হুকুমের জোরে কাজ করায়, অতিকায় ফড়িংকেও হয় তো ঠিক তেমনি বাগ মানিয়ে খাটিয়ে নেওয়া অসম্ভব হবে না।'

"এ আজগুবি কল্পনার পেছনে অনর্থক সময় নষ্ট করতে আমি তাকে বারণ করলাম, কিন্তু আমার নিষেধে তার রোখ যেন আরো বেশী চেপে গেল। ভাবলাম, ল্যাবোরেটারী থেকে ছাড়িয়ে কিছু দিন অন্য কোথাও

পাঠালে ছেলেটার মাথার ছিট বোধ হয় কিছুটা কমবে। এর ঠিক কিছু দিন পরই রেলওয়ে-অ্যাকসিডেণ্টে ভুল খবর বার হওয়াটা ওর পক্ষে একটা সুবিধারই কারণ হ'ল—লোকালয়ের বাইরে, এতদিন ধরে সাধনার পর সবে কিছু দিন হ'ল ও সিদ্ধিলাভ করেছে। কাল বিকেলে ও তার অতিকায় ফড়িংএ চড়ে দূরের ওই পাকুড় গাছটার ওপর থেকে আমার মুখের ওপর নীল আলো ফেলছিল। মহাভারতের অর্জুন যেমন বাণ মেরে দ্রোণাচার্যের পাদবন্দনা করেছিলেন, ওর আলো ফেলার মানেও অনেকটা তাই—অর্থাৎ বিজয়ী হয়ে আমাকে সম্ভাষণ করা। ভাবটা যেন এই—কেমন, আপনার চোখে আমি উন্মাদ, না? খানিকটা বাদেই আমি ব্ল্যাক্‌বোর্ডের ইঙ্গিতে তাকে জানানে চেষ্টা করলাম যে বিজ্ঞানের 'লরেল' সে-ই পেয়েছে—পাতায় তৈরী লরেল মুকুটই গ্রীসদেশের সব চেয়ে বড় সম্মান ছিল কিনা—সাহেবরা ওই থেকেই আইডিয়াটা নিয়েছে। আমার সে ইঙ্গিত অবিনাশ বোধ করি টের পায় নি, কেননা দ্বিতীয়বার সে তো আর ল্যাবোরেটারী-মুখো হয় নি! ইডেন গার্ডেনের বাগান অনেকখানি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় দেশশুদ্ধ লোক অবাক্ হয়ে গেছে, আমি কিন্তু হই নি; তার কারণ' আমি জানি অমন পরিপাটি বাগানটি দেখে অতিকায় ফড়িংএর ক্ষিদে পাওয়া স্বাভাবিকই।

"কিন্তু আজ খবরের কাগজে যা বার হয়েছে তাতে আমি বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছি জগদিন্দ্র, আমার বুকটা কেন জানি না, দুরু দুরু করছে। মনে হচ্ছে ওই রাক্ষসাকারের জীবটা অবিনাশের হুকুম আর তামিল করতে রাজী হচ্ছে না। নইলে, ধান খেয়ে খেয়ে ক্ষেতের পর ক্ষেত উজাড় করে দিচ্ছে, গায়ের ধাক্কায় নিরীহ চাষীর পাঁজর গুঁড়ো করে ফেলছে, অবিনাশ কিছু আর এ সবের প্রশ্রয় দিচ্ছে না! অথচ সে নিরুপায়, এ অবস্থায় জানোয়ারটাকে একলা ছেড়ে দিয়ে সে নেমেও পড়্‌তে পার্‌ছে না, তাকে সাম্‌লে নেওয়ারই চেষ্টা কর্‌ছে নিশ্চয়।

"আজ দিনের শেষে কি সংবাদ শুন্‌তে হবে ভগবান্‌ই জানেন। ......তুমি জামা-কাপড় পরে নাও, এক্ষুনি আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে লালবাজারে যেতে হবে।"

অদূরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ডক্টর আচার্য ধীরে ধীরে রিসিভারটা কানে তুলিয়া স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যালো, কোত্থেকে কথা কইছেন?" পরমুহূর্তেই দারুণ উৎকণ্ঠময় তাঁর কণ্ঠস্বর একেবারে

বদ্লাইয়া গেল, তিনি ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করতে লাগিলেন, "মেডিকেল কলেজ থেকে? ব্যাপার কি? অ্যাঁ, বলেন কি! শয়তানের এরোপ্লেনটাকে গুলি করে নামান হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফড়িং তা জানি, কিন্তু আরোহীটির খবর কি? সিরিয়াস্‌লি ইন্‌জিওর্ড্? আমায় দেখতে চাইছে? আমি এক্ষুণি রওনা হচ্ছি, এক্ষুণি। কিন্তু ডক্টর বোস্, বাঁচবে তো? কি বললেন, হোপ্‌লেস্? হা ভগবান্!"

অধ্যাপকের স্বর যেন কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল।

মিনিট্ পনেরো পরে জগদিন্দ্রের কাঁধের উপর ভর রাখিয়া বিবশ-প্রায় ডক্টর আচার্য কোন মতে মেডিকেল কলেজের ফটকে গাড়ী হইতে নামিলেন।

কবিতা

সবই ভুল

কলকাতা ভুলে ভরা, শোনা ছিল ভাই রে,
আমি দেখি ভুলে ভরা গোটা দুনিয়াই রে;

মুখে মোর রোচে নাকো আম, জাম, লিচু গো,
হেনকালে পাই যদি জলপাই কিছু গো!
ভোম্বল বলে, চল জলপাইগুড়িতে,
যত চাই জলপাই ভরে দেব ঝুড়িতে;
সেথা গিয়ে একি শুনি, হায় হায় হায় রে,
সে মুলুকে শুধু নাকি চা-ই পাওয়া যায় রে!
জলপাই নাই নাই, আছে চা-ই—বল না,
তবে কেন চা-ই গুড়ি নাম তার হল না?

অতি কাছে রংপুর ভরা নানা রঙ্গে—
রং-চটা বাক্সটা ছিল মোর সঙ্গে,
এই ফাঁকে সেইটাকে করে নেব লালচে,
সেথা গিয়ে বুঝলাম পোড়া এ কপাল যে!
ভরা গোটা শহরটা ভাঙ এ আর তামাকে,
ডাবা হুঁকো এনে বলে টান দিতে আমাকে।
এক ফোঁটা রং নেই বেরঙা এ শহরে,
কোন গরু রংপুর নাম দিল কহ রে?
বিস্তর বর্ণিলে বেড়ে যাবে পুঁথিটা,
সংক্ষেপে জেনে রাখ শুধু মোটামুটিটা।
ভেবেছিনু ঢাকা বুঝি ঢাকনিতে ঢাকা গো,
গিয়ে দেখি শহরটি বিলকুল ফাঁকা গো,
ধানবাদে ধান নেই—নিয়ে এই ধারণা
কি ঠকাটা ঠকেছিনু ভাবতেও পার না।

জানা ছিল বড়া বুঝি দেখে নাই হাবড়া
আফশোষে ফোঁসে ভাই—হা বড়া ! হা বড়া !,
সেই দিন পার হয়ে গঙ্গার পুলটা
একেবারে ভেঙ্গে গেছে আমার সে ভুলটা।
'টিশনের' কিনারায় যত ছাতু-মূর্তি
বড়া ভাজা খেয়ে করে উদরটি পূর্তি !

বর্ধমানের নামে ভাবিনু এ শহরে
লোকগুলি রোজই বুঝি বাড়িতেছে বহরে।
গিয়ে দেখি যে ছিল গো তিন হাত আমারি,
দেড় হাতে নামিয়েছে ম্যালেরিয়া বেমারি।

পুরী ধামে প্রসাদটি পুরী নয়, তা জানো ?
সাদা ভাত—থালা ভরে, থরেথরে সাজানো।
"ভাত কেন পুরী আনো" বলেছিল কুণ্ডু,
পাণ্ডা রাগিয়া বলে, "তুম্হার মুণ্ডু।"

মনে মনে ছিল মোর অতি বড় ভাবনা
পাবনাকে খুঁজে বুঝি কোন দিনই পাব না !
রবিবারে শ্যালদায় চড়ে রেল গাড়ীতে—
সোমবারে একেবারে পাবনার বাড়ীতে !

---

* প্রসিদ্ধ গায়ক নলিনীরঞ্জন সরকারের 'কলকাতা ভুলে ভরা' গান দ্রষ্টব্য

[illegible] বার !. শনিবার !!

[illegible] বার, শনি [illegible] জুটে অনিবার,

[illegible] যে [illegible] তোরে গণিবার।

[illegible] জিয়া [illegible] কোনমতে ভাই রে,

আহ্লাদে [illegible] লিখি আমি আর নাই রে !

একসাথে [illegible] কথা সাথে লাথে গো,

[illegible] হতো উঁকি দিতে থাকে গো !

মনে পড়ে ঘোষেদের [illegible], কলা, বাতাপি,

([illegible] বলে কিনা মেধা নাই তথাপি !)

রবিবার পারে না রে তোর সাথে যুঝিতে,

তো'তে গাঁথা রবিবার এ কথাটা বুঝিতে

পারে নাকো—থাকে যদি এত বড় হাঁদাটা—

ঝুড়ি ঝুড়ি গোবরেতে ভরা তার মাথাটা !

মোর চোখে তোর চেয়ে কেউ দাদা, বড় না,

আঁধারেতে আলো তুই, মরু মাঝে ঝরণা।

কোথাকার কি জিনিস কতখানি মিষ্টি

কবি দিয়াছেন তার এত বড় লিষ্টি

'পেটুকের ভূগোলেতে' * তোর নাম নাই তো,

কতখানি অবিচার ! মনে ভাবি তাই তো।

গোল্লা সে লাগে ভালো থাকি যদি নাটোরে,

পাঁচ কোশ দূরে গেলে গুণ তার খাটো রে !

এক ঠাঁই শুধু ভাই, মিঠা সরপুরিয়া—

শনিবার মিঠা যে রে ধরাখানা জুড়িয়া !

শনিবার, শনিবার—কি মজার নাম রে !

নিউটনও হেরে যায় কষিবারে দাম রে !

কি করিয়া বলি সে যে কতখানি মিষ্টি,

সেই শুধু দুনিয়ায় করে সুধা বৃষ্টি !

শ্রীরামের হনুমান ছিল সেরা ভক্ত,

আমি হনুমান ভাই, তোর অনুরক্ত।

শুধু এই বর মাগি হনুমান দাদা রে,

পদে তোর স্মৃতি মোর থাকে যেন বাঁধা রে !

---

* কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'পেটুকের ভূগোল' কবিতা পঠিতব্য।

ভালবাসি

ভালবাসি, যবে শশী আ[illegible]শের গায়
আলোকের ঝলকের বন্যা ছড়ায়
উদয়-অচলে যবে ভানু দেন দেখা,
দীঘি-জলে উচ্ছলে কনকের রেখা
বড় ভালবাসি আমি অবারিত মাঠ,
আমার সে খুলে দেয় মনের কপাট ;
আর ভালবাসি আমি উদার সাগর,
বিরাট নগাধিরাজ ধ্যান-সুন্দর ;
ভালবাসি শরতের শ্যামল ধরণী,
মরতে ছড়ান যেন মরকত-মণি !

ভালবাসি ফাগুনের সাজানো বাগান,
ফুলের সুবাস আর পাখীদের গান ;
ভালবাসি, সন্ধ্যায় যদি বৈশাখে
দখিণের মিঠে হাওয়া গায় এসে লাগে ;
ভালবাসি আষাঢ়ের টুপুর টুপুর,
বরষা রাণীর যেন পায়ের নূপুর !
তারি মাঝে ফুটে ওঠে যদি রামধনু
পুলকে দ্যুলোকে ওড়ে আমার এ তনু ।
এ সবের চেয়ে আমি আরো ভালবাসি
তোমাদের কচি মুখে স্বরগের হাসি ।